যদি

রবি গুহ মজুমদার

স্বর্গ, ধর্ম ও পরমতপের প্রতীক পিতৃদেবকে

প্রথম সংস্করণ :

কার্তিক ১৩৬৫

প্রকাশ করেছেন :

শ্রীমতী রূপা মজুমদার

ডাক পাবলিশার্স

১।১।১ হাজরা রোড

কলিকাতা ২৬

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন :
শ্রীঅরুণ কুমার পাইন

বই ছাপিয়েছেন :
শ্রীপ্রাণধন রায়
ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং হাউস
১২নং বলরাম বসু সেকেণ্ড লেন
কলিকাতা ২০

ব্লক তৈরি করেছেন ও প্রচ্ছদপট ছাপিয়েছেন :
রেডিয়েণ্ট প্রসেস
৬এ সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী রোড
কলিকাতা ১৩

বাঁধিয়েছেন :
নন্দী ব্রাদার্স
১০ করিস চার্চ লেন
কলিকাতা ৯

দাম : সাড়ে তিন টাকা

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস :

যতদূর পৃথিবী ততদূর পথ

বনহরিণীর কাব্য (যন্ত্রস্থ)

উপন্যাসের প্রারম্ভে অবতরণিকা লেখার প্রথা আছে। তার নামকরণ সম্পর্কে জবাবদিহি করার প্রথা হয়ত নেই। এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম করতে হল, কারণ, যে উপাখ্যান আপনি পড়তে যাচ্ছিলেন তা যদি সত্যিই পড়তেন, তাহলে পরে লেখককে প্রশ্ন করতেন যে উপাখ্যানের সঙ্গে আখ্যার কোন সম্পর্ক নেই কেন?

লেখকের বক্তব্য হল এই যে, আদিম মানব যখন বিস্মিত নেত্রে চারিদিকে চেয়ে কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না, সে হয়ত একটি কথাই বলবার জন্যে বার বার চেষ্টা করেছিল—যদি, যদি, যদি। বীজমন্ত্রের মত মনে মনে সেই কথা উচ্চারণ করতে করতে তার মনে জেগেছিল কৌতূহল, বুদ্ধি, বিবেচনা। সেই থেকে মানুষের সঙ্গে যদিরও বংশবৃদ্ধি হতে লাগল। এক যদি থেকে অসংখ্য যদির সৃষ্টি হল। দেখা গেল যদির প্রচণ্ড শক্তির সাহায্যে মানুষ পারেনা এমন জিনিস নেই।

সেই শক্তি দিয়ে মানুষ আজ অবধি কী কী করেছে তা বর্ণনা করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। লেখকের উদ্দেশ্য হল মনে

করিয়ে দেওয়া যে একদিকে যদির শক্তিতে মানুষ যেমন শক্তিমান, অন্যদিকে যদির শৃঙ্খলে সে তেমনই শৃঙ্খলিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, মাকড়সার মত নিজের চারিদিকে যদির জাল সৃষ্টি করে, পিপীলিকার মত যদির গোলকধাঁধাঁয় বাস করে, মানুষ মনে করে তার জীবন বৈচিত্র্যময়।

এই বৈচিত্র্যজ্ঞান থেকে উপন্যাসের উৎপত্তি। যদির কেলিডোস্কোপে এক জীবনের বহু অভিব্যক্তি। সুতরাং সে দিক থেকে 'যদি' আর 'উপন্যাস' সমার্থব্যঞ্জক। 'যদি' মানেই 'উপন্যাস'। যে কোন উপন্যাসকে 'যদি' বলা যেতে পারে।

দুই

উপন্যাস যখন আরম্ভ হল তখন বর্ষাকাল। এই বর্ষাকালের জন্যে বিরূপ কাল গোনে। প্রথম বর্ষার সাড়া পেলে সে পাগলের মত হয়ে যায়। কুচকুচে কালো মেঘের ঠাণ্ডা হাত গায়ে লাগলে সে আর স্থির থাকতে পারে না। মন্ত্রমুগ্ধের মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তাকে যেন নিশিতে পায়।

হাঁটতে হাঁটতে বিরূপ চলে যায় গড়ের মাঠে। নির্জন সবুজ মাঠ—মখমলের মত নরম, পেছল। যেন এক বিরাট নাচের আসর—উৎসবের প্রতীক্ষায় উন্মুখ। অন্তরাল থেকে নর্তকীদের নূপুর গজগামিনী ছন্দে বাজতে থাকে। তারপর হঠাৎ দামামা

বেজে ওঠে। আর দামিনীর ইসারায় ছুটে আসে অগণ্য নর্তকীর দল। মৃদঙ্গের তালে তালে শুরু হয় তাদের নাচ।

কথক, রাম্ভা, জিটারবাগের সঙ্গে মেলেনা সে নাচ। তবু বিরূপকে আত্মবিস্মৃত করে দেয় জলদের সেই জলদ ছন্দ। ঘুরন্ত বাতাস আর দুরন্ত বৃষ্টির মধ্যে বিরূপ খুঁজে পায় লাস্য ও তাণ্ডব নৃত্যের সমাবেশ।

তিন

দুর্ভাগ্যকে পরাভূত করে যারা পরিশ্রমের মূল্য আদায় করতে জানে বিভূতি তাদের মধ্যে একজন। তা নাহলে পিতৃবিয়োগের পর সামান্য রোজগারের ওপর নির্ভর করে সে সংসারের ভার হাসিমুখে বহন করতে পারত না।

তখন সে সবে চাকরিতে ঢুকে বংশরক্ষার জন্যে বিয়ে করেছে। বিরূপ ক্লাশ সেভন-এ পড়ে। ছোট বোন মায়া আরও ছোট। হেমাঙ্গিনী ভেবেছিলেন সংসার বুঝি বা ভেসে যায়। বিভূতি বুঝি তার নিজের পরিবারের চারিদিকে গণ্ডি টেনে দেয়। কিন্তু বিভূতি তা করল না। সর্বনাশের ভয়ে অর্দ্ধেক ত্যাগ না করে সে সকলকে এক দড়িতে বেঁধে পর্বতের গা ঘেঁষে এগিয়ে চলল। বরদা প্রসন্ন হলেন। পাঁচ বছরের মধ্যে বিভূতি তার আপিসের সিঁড়ির দুটো ধাপ উঠে গেল।

বিভূতির স্ত্রী সুনীলার এক অপবাদ দূর হল। পরে সে শ্বাশুড়ীর দুই কোলে দুই বংশধর প্রণামী দিয়ে তার অন্য অপবাদ ঘোচাল।

সেদিনের কথা হেমাঙ্গিনী ভুলে যাননি। তবু তাঁর মাঝে মাঝে মনে হত বিভূতি ঠিক যা করা উচিত তা করছে না। অন্ততঃ বিরূপের ওপর তার কর্তব্য সে পুরোপুরি পালন করছে না।

হেমাঙ্গিনীর ধারণা ছিল যে বিভূতি ইচ্ছে করলেই বিরূপকে একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে, তার বিয়ে দিয়ে, তাকে গার্হস্থ্য জীবনের খাঁচায় পুরে দিতে পারে। বিরূপ তিন তিনটে পাশ করার পরও বিভূতি যখন তা করল না, অকারণ বিরূপকে যখন এম-এ ও ল পড়ার অনুমতি দিল, হেমাঙ্গিনী নিরাশ হয়ে নীল-কলেবর রাস-রসময়ের শরণাপন্ন হলেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ রাস-রসময় কোন বিহিত করলেন না। শুধু চৈতন্য দিলেন যে দৈবের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া সংসারী লোকেদের সাজে না।

হেমাঙ্গিনী আবার কর্তব্যচেতন হয়ে উঠলেন। একদিন সুযোগ বুঝে বিভূতিকে বললেন, 'হ্যাঁরে, তোর কচিমামা যে বলছিল চাকরি করতে করতেও পড়া যায়—তবে তোর আপিসে বিরুর একটা চাকরি করে দিচ্ছিস না কেন?'

—'দেখি।'

হেমাঙ্গিনী চটে গেলেন। সুনীলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, 'সব কথায় খালি 'দেখি' আর 'দেখি'। তার মানে কি আর আমি বুঝি না?'

সুনীলা কথা বাড়াতে দিল না। শ্বাশুড়ীর সঙ্গে একমত হল যে সমস্ত দোষ তার স্বামীরই।

সুনীলার কিন্তু পছন্দ হয়নি যে বিরূপ তার দাদার আপিসে কেরানী হয়ে ঢোকে। রাত্রে সে স্বামীকে বলল, 'ঠাকুরপো কি তোমাদের মত দশটা পাঁচটা আপিস করতে পারবে? তার চেয়ে ওকে এমন একটা চাকরি করে দাও যে সারাদিন কলম না পিষে রাস্তায় ঘাটে ঘোরাঘুরি করতে হয়—আবার মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরে গিয়ে কখনও ট্রেনে, কখনও সাইকেলে, বা মোটরে, কিংবা নৌকোয়, বা গরুর গাড়িতে বেড়িয়ে বেড়াতে পারে।'

বিভূতি হেসে বলল, 'বেশ।'

হাসির মধ্যে ভেজাল থাকলে গা জ্বালা করারই কথা। সুনীলা গোমড়া মুখ করে বলল, 'বেশ-মানে?'

বিভূতি বলল, 'তুমি বিরূর জন্যে যে চাকরির ফরমাশ করলে তা খুঁজে বার করতে সময় লাগবে। তা ছাড়া—।'

—'তা ছাড়া কী?'

—'মানে, বিরূর চাকরি করে দেবার আসল উদ্দেশ্য হল তাকে—ধর, ঘরের চাকরিতে বাহাল করা। কিন্তু তোমার পছন্দমত চাকরি পেলে সে দুটো চাকরি বজায় রাখতে পারবে কিনা সন্দেহ।'

—'থামো। বিয়েকে যদি তোমরা চাকরি বলে মনে করতে তা হলে আর ভাবনা ছিল না। নতুন-বৌ ঘরে এনে কী আদরে রেখেছিলে তা কি ভুলে গেছি? প্রথমেই নাম দিলে অপয়া। যেন আমার জন্যেই বাবা মারা গেলেন। তারপর রব উঠল—।'

—'ঘটনাচক্রে এ রকম একটু আধটু বদনাম সাধুদেরও হয়ে থাকে। বধূদের যে হবে তা আর আশ্চর্য কী?'

—'তা নয়। পুরুষদের তাতে স্বার্থ আছে বলেই তারা ও রকম বদনামের প্রশ্রয় দেয়। যদি একটা ছুতো করে আর একবার ছাঁদনাতলায় ঘুরে আসা যায়।'

বিভূতি মুচকি হেসে বলল, 'যাই হোক, তোমার বদনাম তো দূর হয়েছে? এবার দুর্গানাম করে শুয়ে পড়।'

চার

খুব ভোরে বিরূপের যখন ঘুম ভাঙল বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। এত সকালে এত বৃষ্টি বড় একটা হয় না। কাঁচা কয়লার মত রং হয়েছে আকাশের। কোথাও এক ছিটে আগুনের ছটা লাগেনি।

বিছানার উষ্ণ আরামে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে বিরূপ এক একবার চোখ খুলছিল আবার বন্ধ করছিল। পূবের জানলা দিয়ে অল্প অল্প ছাঁট এলেও জানলা বন্ধ করতে ইচ্ছে করছিল না তার। সে দেখছিল খড়খড়ির উপর সপসপে রোঁয়াওলা শালিকটাকে। আর থেকে থেকে তারই মত শিউরে উঠছিল।

এমনভাবে বেশীক্ষণ শুয়ে থাকা যায় না। বিরূপ বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। শালিক পাখিটা ভয় পেয়ে উড়ে গেল। কী সুন্দর, ঠাণ্ডা, জোলো হাওয়া! বিরূপ বুক ভরে শ্বাস নিল।

জানলা দিয়ে আশপাশের বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিরূপ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তার মনে হল বন্ধঘরের বন্দিশালায় কোনও হাওয়া পাখার ঘানিতে ঘুরছে, কোনও হাওয়া উনুনের

আগুনে পুড়ছে। যেন তাদেরই উদ্ধার করার চেষ্টায় বর্ষার এই অভিযান। আবার কোনও বাড়ির গায়ে লাগান মোটা পাইপ দিয়ে তোড়ে জল পড়ছে। অজস্র ফেনা ভেঙে পড়ছে রাস্তার ওপর। ছাতের আলসেতে সে জল বাঁধা থাকবে না। পথকে সে চিনবে। তেমনি, ও পাশে গোয়ালঘরের টিনের চাল বেয়ে অনেকগুলো ঝরনা একসঙ্গে নেমে আসছে। তাদেরও এক লক্ষ্য— মুক্তি চাই। গোয়ালের ভেতর দড়িবাঁধা গরু দুটোও পা ছুঁড়ছে।

চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বিরূপ নিজেকে ভুলে গেল। সে ভুলে গেল যে সে বিরূপ বোস—যে এই ছোট ঘরটিতে থাকে— ঐ যার খাট—আলনায় ঐ যার জামা কাপড়—ঐ যার টেবিল, চেয়ার, বই। নিজেকে তার ভীষণ হালকা বোধ হতে লাগল। তার মনে হতে লাগল যেন এই জোলো হাওয়ায় সে ছেঁড়া আমপাতার মত উড়ে যাবে। গরাদের ফাঁক দিয়েই সে যেন বেরিয়ে যাবে।

বিরূপ যে কখন বাড়ি ছেড়ে গড়ের মাঠের রাস্তা ধরেছে সে নিজেই টের পায়নি। যখন খেয়াল হল চেয়ে দেখল রাস্তার দুধারে সবুজ গাছপালা স্নানের রোমাঞ্চে শিরশির করছে। জলপ্লাবিত রাজপথ কয়েকটি ছোট ছেলেকে নিয়ে খেলছে সাগর-সাগর খেলা। বৃষ্টি মাথায় করে ছেলেগুলো কাগজের নৌকো ভাসাচ্ছে।

গড়ের মাঠের মাঝখানে পৌঁছে বিরূপ চারিদিকে তাকাল। কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। শুধু সবুজ ঘাসের ওপর অসংখ্য জলের ফুলঝুরি। মুখ তুলে চাইলে দেখা যায় বাতাসের ঢেউয়ের সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি নেমে আসছে। কী উচ্ছ্বাস সারা আকাশে! কী উচ্ছ্বাস প্রতিটি জলকণায়! বিরূপ আকাশের দিকে চেয়ে সেই আনন্দ-উৎসব উপভোগ করতে লাগল। যেন উৎস থেকে আনন্দ

পান করতে লাগল। বৃষ্টির স্রোতে তার মাথার একটি একটি চুল থেকে পায়ের একটি একটি নখ যেন ভেসে যেতে লাগল। তার দেহ যেন দ্রবীভূত হয়ে যেতে লাগল অনর্গল জলধারায়। বিরূপ তার জবজবে চুলগুলো আঙুল দিয়ে কয়েকবার পেছনে ঠেলে জলমগ্ন ঘাসের ওপর বসে পড়ল।

আবার ঝেঁকে বৃষ্টি এল।

এমনি কোনও দিন বর্ষার প্লাবনের মাঝখানে সসাগরা ধরণীর জন্ম হয়েছিল। হয়ত তাই এই ঋতু স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায় পৃথিবীর জন্মতিথি, ছড়িয়ে যায় নবজন্মের বীজ। কিন্তু, বিরূপ ভাবে, সেদিনকার পৃথিবীর সঙ্গে তার আজকের সম্বন্ধ কে পাতাল? কে তাকে প্রথম এ জগতে নিয়ে এল? সে কি মাছ? সে কি কীট? সে কি বৃষ্টি? বিরূপের মনে বিস্ময়ের ঝড় বয়ে যায়। ঐ যে বর্ণহীন জলবিন্দুগুলো!—পৃথিবীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে স্বর্গচ্যুত দেবশিশুর মত! কত মুমূর্ষুকে জীবন্ত করবে, কত বিরসকে সরস করবে, কত ধূসরকে রঙিন করবে। ওরা কি শুধুই জল? দু ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন?

পাঁচ

অন্যদিন বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরে বিরূপ বীরের সম্মান পেত। মা আগে থাকতে শুকনো ধুতি আর গেঞ্জি ঠিক করে রাখতেন। বৌদি উনুনে চায়ের কেটলি বসিয়ে ঘন ঘন পাখার হাওয়া করতেন। আর মায়া বাড়ি থাকলে বিরূপের গলা পেয়েই ছুটে এসে শাসনের ভঙ্গীতে বলত—'ছোটদা, আবার?' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মায়ার গর্বিত নাসারন্ধ্র এমনই ফুলে উঠত যে মনে হত বিরূপ বিরাট একটা কিছু করে এল যা ইতিহাসের পাতায় সোণালী অক্ষরে লেখা থাকবে।

আজ কিন্তু সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। বিরূপ নিজের ঘরে গিয়ে আলনা-আলমারি হাঁটকে জামা-কাপড় বদলাল। চাকর চা নিয়ে এল এক ঘণ্টা পরে। বিরূপ শুনল যে মার কাছে বকুনি খেয়ে মায়া স্কুলে যায়নি—কান্নাকাটি করে বাড়ি মাথায় করেছে। তাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত।

খেতে বসে বিরূপ ভারিক্কি চালে বৌদিকে বলল, 'আরও আস্কারা দাও না! শেষে ঐ মেয়ের বিয়ে দিতে যখন নাকের জলে চোখের জলে হবে, তখন বুঝবে।'

বিরূপকে অবশ্য বলা হয়নি যে মায়ার এই নাটকীয় অভিমানের সঙ্গে তার নামও জড়িত ছিল। তুচ্ছ ব্যাপার। মায়ার অন্তরঙ্গ বন্ধু নমিতা। ফর্সা, রোগা ডিগডিগে। প্রায়ই আসে যায়। বিরূপ ভাল করে চেয়েও দেখেনি তার দিকে। মার কাছে হঠাৎ মায়া পেড়ে বসল ছোটদার বিয়ের কথা এই নমিতার সঙ্গে! হেমাঙ্গিনী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বামুনের

মেয়ে নমিতা—তা জেনেও ঘটকালি করতে আসে ঐটুকু মেয়ের এতখানি স্পর্দ্ধা? হেমাঙ্গিনী বেঁচে থাকতে মায়া যেন ওকথা আর মুখেও না আনে কোনদিন।

মায়া অভিমানে ভেঙ্গে পড়ল। তার উদ্দেশ্য ছিল সাধু। তার আর নমিতার বন্ধুত্ব অটুট রাখবার এই একটা পন্থা সে নিজেই আবিষ্কার করেছিল—তার মধ্যে অন্য কারুর ইঙ্গিত ছিল না। অবশ্য নমিতার ওপর করুণাও ছিল মায়ার এক গোপন দুর্বলতা।

মামার সংসারে মানুষ নমিতা। তার বিধবা মাকে রান্নাঘরের বাইরে কেউ কোনদিন দেখেনি বললেই হয়। আর তার জন্যে দোষও দেওয়া চলে না নমিতার মামাকে। তাঁর নিজের পরিবারই যথেষ্ট বড়। অন্নবস্ত্রের সমস্যা মেটাতেই প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হয়ে যেত। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, বিয়ে এসব কথায় কান দিতে পারতেন না তিনি। ঈশ্বর যা করেন তাই মঙ্গল বলে মেনে নিতে রাজী ছিলেন। সুতরাং গলগ্রহ ভগিনীর মেয়ে নমিতা ওরই মধ্যে কী করে বিনা মাইনেতে পরের বই চেয়ে এনে বছরের পর বছর স্কুলের পড়াশুনো চালিয়ে যাচ্ছিল তাই দেখেই তিনি আশ্চর্য হয়ে যেতেন। নমিতার ভবিষ্যতের দিকে তাকাবার কোন প্রশ্নই জাগেনি তাঁর মনে।

মায়া তাই এই ভয় করেছিল যে দুদিন পরে নমিতাকে ভালমন্দ নির্বিচারে যে কোন পাত্রের হাতে তুলে দিয়ে নমিতার মা ও মামা দুজনেই নিশ্চিন্ত হবেন—তারপর আর নমিতাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

যাই হোক মায়ার ঘটকালির কাহিনী বিরূপের কানে না পৌঁছলেও মায়া নমিতাকে না বলে থাকতে পারেনি। সেই থেকে নমিতা আর মায়াদের বাড়ি যেতে চাইত না। ফলে, দুজনের

মাঝখানে এমন একটা পাঁচিল গড়ে উঠতে লাগল যা দেখাও গেল না, ভাঙ্গাও গেল না।

ছয়

বছর ঘুরতে লাগল। যথা সময়ে মায়া ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ঢুকল। নমিতাও পাশ করল কিন্তু কিছুদিন পরে মায়া শুনল কোনও এক উদার ভদ্রলোক বিনা পারিশ্রমিকে নমিতাকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখাতে রাজী হওয়ায় সে পড়াশুনো ছেড়ে সঙ্গীত-সাধনার অপার সমুদ্রে নেমে পড়েছে।

ইতিমধ্যে বিরূপ এম-এ পাশ করেছিল। তার আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার খবর বেরতে হেমাঙ্গিনী ফুল ও প্রসাদ বিরূপের মাথায় ঠেকিয়ে তার হাতে দিয়ে বললেন, 'নারায়ণ! নারায়ণ!'

বিভূতি সন্ধ্যাবেলা জিজ্ঞেস করল, 'এবার কী করবে?' বিরূপের যেন চমক ভাঙ্গল। সত্যিই তো! এবার কী করবে সে? চট করে কোন জবাব সে দিতে পারল না।

প্রশ্নটা যখন তখন বিরূপের কানে ভনভন করতে লাগল—'এবার কী করবে? এবার—?' একটা সদুত্তর পাবার আশায় বিরূপ খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনগুলো কদিন খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগল। নানা রকমের চাকরি। সামান্য থেকে অসামান্য বেতন। কলকাতায়, মফস্বলে, ভারতে, বিদেশে। যোগ্যতার বিভিন্ন চাহিদা। কেউ চান ডাক্তার, কেউ এঞ্জিনিয়ার, কেউ আশা করেন বিশেষ অভিজ্ঞতা। গত পাঁচ বছর বা দশ বছর কী করেছ তুমি? বিরূপ পড়তে পড়তে কল্পনারাজ্যে চলে যেত। এক একটা চাকরি মনে মনে গ্রহণ করে স্বপ্ন দেখত জেগে জেগে।

এই রকম যখন বিরূপের মনের অবস্থা, হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার মুখে তার দেখা হল নমিতার সঙ্গে, রাস্তায়। নমিতার সঙ্গে ছিলেন এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক।

—'এই যে নমিতা!'

নমিতা নমস্কার করল কি করল না বোঝা গেল না। তার লজ্জায় জড়সড় ভঙ্গী বিরূপের চোখে পড়েনি। সে সরল ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আজকাল আমাদের বাড়ি যাওনা কেন? মায়ার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?'

নমিতা হেসে বলল, 'যাই তো!'

হিসেব করলে দেখা যেত নমিতা অন্তত: এক বছর মায়াদের বাড়ির দিকে পা বাড়ায়নি।

নমিতার সঙ্গে যে ভদ্রলোকটি ছিলেন বিরূপ তাঁর দিকে তাকাতে নমিতা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'ইনি ললিতবাবু। আমার গুরু।'

—'গুরু?' বিরূপ ঠিক বুঝতে পারেনি।

—'এঁর কাছে আমি গান শিখি।' নমিতা সঙ্গে সঙ্গে ললিতবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'ইনি বিরূদা।'

নমস্কার বিনিময় করে ললিতবাবু বললেন, 'আপনার নাম আমি নমিতার মুখে অনেকবার শুনেছি। আপনার বোন মায়ার সঙ্গেও আমার একবার আলাপ হয়েছিল নমিতাদের বাড়িতে। ভারি ভাল মেয়ে।'

বিরূপ খাপছাড়া ভাবে বলল, 'এদের দুই বন্ধুতে খুব ভাব।'

ললিতবাবু বললেন, 'যাক আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব খুশি হলাম। অবশ্য আমি জানিনা আপনি নিজে সঙ্গীতজ্ঞ কিনা তবে আশা করি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ওপর আপনার কোন আক্রোশ নেই।'

নমিতা হেসে ফেলল। সে মায়ার মুখে শুনেছিল বিরূদার সঙ্গে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কী সম্বন্ধ।

বিরূপ কী বলতে যাচ্ছিল, ললিতবাবু তার আগেই তাকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর স্কুলে গিয়ে নমিতা ও অন্যান্য ছাত্রীদের গান শোনবার।

—'এখুনি ?' বিরূপ আমতা আমতা করতে লাগল।

—'তাতে কী হয়েছে ? এই তো কাছেই আমার স্কুল। আপনার ভাল লাগবে কিনা জানিনা—তবে আমি মাঝে মাঝে অতিথি পেলে খুশি হই। দেখি আমার ছাত্রীরা নতুন শ্রোতার কাছে ভয়ে গাইছে না নির্ভয়ে ।'

—'শ্রোতাকে তার জন্যে দায়ী করেন না নিশ্চয়ই।' বিরূপ নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল।

—'মাঝে মাঝে করি, মিথ্যে বলব কেন ? কিন্তু সেটাও আমার একটা গবেষণার বিষয়।'

—'তাহলে বলুন আপনার এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের গিনি পিগ্ করে আমায় নিয়ে যেতে চান।'

—'যদি মনে করেন গান শোনালে আপনাকে হত্যা করা হবে তবে তাই।'

বিরূপ আর আপত্তি করতে পারল না। হাসতে হাসতে বললে, 'চলুন। আমি প্রস্তুত।'

সাত

বলাবাহুল্য গান শোনার ব্যাপারে বিরূপের কোন উৎসাহ ছিল না। নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে এবং যেহেতু সে বেকার, বিরূপ প্রমাণ করতে চাইল না যে তার সময়ের দাম আছে। ললিতবাবু আর নমিতার সঙ্গে সে হাঁটতে লাগল।

বড় রাস্তা ছেড়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকে আরও খানিকটা গিয়ে ললিতবাবু থামলেন। সামনে বহু পুরনো লাল রঙের একটা দোতলা বাড়ি দেখিয়ে বললেন, 'এর ভেতরে আমার স্কুল। আসুন।'

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বিরূপ জিজ্ঞেস করল, 'কার বাড়ি?'

প্রশ্নটা স্বাভাবিক। কোনও দিন এক ধনাঢ্য পরিবার যে এই অট্টালিকায় বাস করতেন তা বলে দিতে হয় না। অবশ্য বাড়ির আগের জৌলুষ আর নেই। দোতলার টানা লম্বা বারান্দা বয়সের চাপে হেলে গেছে। ফুলকাটা সারি সারি লোহার

রেলিংএ মর্চে পড়েছে। মাঝে মাঝে ফাঁক, যেন ভাঙ্গা দাঁতের ফোকর। একতলায় রোয়াক। সামনে বিরাট হল ঘর—অকেজো আসবাবপত্রে ভরা। দেয়ালে সোণালী কারুকার্য করা চওড়া ফ্রেমে বাঁধান ভাঙ্গা আয়না—এধারে মিহি ছোবড়া বার করা, ছেঁড়া, চামড়া-বাঁধান সোফা-সেট—ওধারে চটা ওঠা, রেকসিন বিহীন প্রকাণ্ড টেবিল। আজ আর কেউ ব্যবহার করে না। ধুলো আর মাকড়সার জালই তাদের আবরণ।

ললিতবাবু বললেন, 'এ অঞ্চলে পালিতদের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। এ রাস্তা এঁদেরই এক পূর্বপুরুষের নামে। আর এ বাড়ির বর্তমান মালিক হলেন মাধবীরঞ্জনবাবু।—পরমুহূর্তে চাপা গলায় বললেন, 'পাড়ার ছেলেরা নাম দিয়েছে পর্দানশীনবাবু।'

বিরূপ হেসে বলল, 'মানে?'

—'মানে, ভদ্রলোকের নামটা যেমন মেয়েলী, তিনি নিজে তেমনি লাজুক। এত লাজুক যে লোক সমাজে তাঁকে বড় একটা দেখতেই পাওয়া যায় না।'

দোতলায় উঠে ললিতবাবু একটা শ্বেতপাথরের প্রশস্ত ঘর দেখিয়ে বললেন, 'এই আমার স্কুল।'

ঘরে কয়েকজন ছাত্রী বসেছিল। ললিতবাবুকে দেখে তারা উঠে দাঁড়াল। ললিতবাবু তাদের বসতে বলে বিরূপকে খাতির করে একটা শতরঞ্জির ওপর বসালেন। বিরূপ চারিদিকে চেয়ে বলল, 'বাঃ—বেশ ঘরখানি তো!'

সত্যিই সুন্দর ঘর। দক্ষিণ খোলা। দেয়ালে বড় বড় তৈলচিত্র। ঘরের একপাশে শ্বেতপাথরের চেয়ার-টেবিল।

ললিতবাবু বললেন, 'এত ভাল ঘরের জন্যে কিন্তু আমার ভাড়া লাগেনা এক পয়সা। ভাড়া অবশ্য ভদ্রলোক দিতেন না কস্মিনকালে—যত টাকাই হোক—কারণ বসত-বাড়ি ভাড়া দিয়ে ইজ্জত খোয়াতে তিনি রাজী নন। তবে অনেক বলা-কওয়ার পর

'তিনি আমায় ঘরখানি স্কুলের জন্যে ব্যবহার করতে দিয়েছেন দুটি সর্তে—এক হল যে স্কুলের নামকরণ হবে তাঁর স্বর্গীয়া মার নামে, আর এক হল যে তাঁর দুটি মেয়েকে আমি গান শেখাব।'

বিরূপ হেসে বলল, 'আপনার বরাত ভাল।'

ললিতবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—'তাহলেই দেখুন, কতটুকু ভাল দেখলে আমরা পরের ভাগ্যকে হিংসে করি। যাক—এবার আমাদের গানের আসর শুরু করি, কী বলুন?'

বিরূপ ঘাড় নাড়ল।

ললিতবাবুর নির্দেশ মত তম্বুরা, হারমোনিয়ম, বাঁয়া তবলা পাড়া হল। তিনি নিজেই তম্বুরা, তারপর বাঁয়া তবলা টেনে নিয়ে সুর মেলালেন।

আসর শুরু করার আগে তিনি ছাত্রীদের মনে করিয়ে দিলেন যে তাদের গান শোনাবার জন্যে আজ একজন মাননীয় অতিথিকে তিনি আহ্বান করে এনেছেন।

ললিতবাবু কনিষ্ঠা ছাত্রীটিকে প্রথমে গাইতে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার গান শেষ হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল একটি মেয়ে। বাঁধান একসারসাইজ বুক্ নেড়ে সে বায়ু-পিপাসা জানাচ্ছিল অনেক আগে থেকেই। এবার ঘন ঘন কব্জি ঘোরাতে লাগল।

ললিতবাবু বাধ্য হয়ে বললেন, 'সুমিত্রা, তোমার তাড়া আছে বুঝি?'

—'হ্যাঁ। ঠিক সাতটার সময় বাবা নিতে আসবেন। বলেছেন রাস্তা থেকে হর্ণ দিলেই আমি যেন নেমে যাই।'

—'আজ দিব্যেন্দু আসেনি?'

—'এসেছিল পৌঁছে দিতে। আপনাদের দেখতে না পেয়ে 'ঘুরে আসছি' বলে কোথায় চলে গেল!'

—'কোথায় আর যাবে? বোধ হয় মাধবীরঞ্জন বাবুর সঙ্গে গল্প করছে।'

বলতে বলতে দিব্যেন্দু পাশের বারান্দা দিয়ে ঘরে ঢুকল।

ললিতবাবু বলে উঠলেন, 'এই যে দিব্যেন্দু, অনেক দিন বাঁচবে তুমি। এসো-এসো—এই দিকটায় বোসো, হাওয়া পাবে। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, ইনি হলেন বিরূপ বাবু, পণ্ডিত লোক—আমাদের আজকের আসরের প্রধান অতিথি।' তারপর বিরূপকে বললেন, 'দিব্যেন্দু হল সুমিত্রার দাদা—বড় ভাল ছেলে। আর বাবার নাম বললেই চিনতে পারবেন—বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীপরিতোষ চৌধুরী—তাঁর একমাত্র পুত্র দিব্যেন্দু।'

—'ও।' নমস্কার লেনদেন হল।

ললিতবাবু বললেন, 'সুমিত্রার যখন তাড়া আছে, ওর গানটা এবার হয়ে যাক।'

সুমিত্রা অযথা সময় নষ্ট না করে হারমোনিয়মটা তাড়াতাড়ি টেনে নিল। তারপর যাদুকরের মত কোথা থেকে একটা সুগন্ধি সিল্কের রুমাল বার করে এখানে ওখানে ছোপ দিতে দিতে বলল, 'কাল ফার্পোয় রুক্মিনী নাটেশানের বার্থ-ডে পার্টিতে আইসক্রীম খেয়ে এমন গলা ধরে গেছে—।'

কেউ মন্তব্য প্রকাশ করল না। কেবল নেপথ্যে 'ফিক্' করে কেউ হাসল বলে মনে হল। বিরূপ ঘাড় বেঁকিয়ে দেখল অপরাধিনী ললিতবাবুর কনিষ্ঠা ছাত্রী, একটু আগে যার গান হয়ে গেল।

সুমিত্রার গান শেষ হবার পর ললিতবাবু শুকনো হাসি হেসে বিরূপকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগল?'

বিরূপ প্রস্তুত ছিল না। বললে, 'উঁ? হ্যাঁ—মন্দ লাগবে কেন?'

তবে সে বলতে পারলে খুশি হত যে মেয়েটি গান শিখেছে কিন্তু গাইতে শেখেনি। বলা যায় না, ললিতবাবু তাহলে হয়ত বলে বসতেন যে গান গাইতে পারা বা না পারা শ্রোতার ওপর নির্ভর করে। তারপর যদি প্রশ্ন করতেন, 'বলুন তো কী রাগ? কী তাল?' তাহলে বিরূপকে অবশ্যই ছুতো করে ক্রুতচম্পট দিতে হত।

যাই হোক বিরূপ মনে মনে বেশ খানিকটা বিরক্তি বোধ করছিল। ভাবছিল ললিতবাবুর কাছে ক্ষমাভিক্ষা করে উঠে পড়বে কিনা। ললিতবাবু যেন তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, 'দেরি হয়ে গেল। আজকের আসর তাহলে নমিতার গান দিয়ে শেষ হোক। এস নমিতা, তুমি তানপুরোটা আর একবার দেখে নাও।'

বিরূপ ইতিমধ্যে হাঁটু ছুটো উঁচু করে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে বসেছিল। তানপুরো নাড়াচাড়া দেখে তার মনটা ভাল হওয়া ছেড়ে দমে গেল। কারণ এ জ্ঞান তার ছিল যে তানপুরোর জান কম করে এক ঘণ্টা।

নমিতা গান শুরু করল।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর বিরূপের হঠাৎ হুঁশ হল যে গান শুনতে শুনতে সে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসল। ধরা পড়ে গেছে কিনা জানবার জন্যে এদিক ওদিক তাকাল। দেখল ললিতবাবুর মুখে হাসি। নমিতার আধখানা মুখ তানপুরোয় ঢাকা, বেচারীর দৃষ্টি যেন লজ্জায় মাটী খুঁজছে।

এক ঘণ্টার কমেই নমিতা গান শেষ করল।

ললিতবাবু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন কেমন লাগল, বিরূপ তার আগেই বলে ফেলল যে এত ভাল গান এর আগে সে কখনও শোনেনি। হয়ত একটু বাড়াবাড়ি শোনাল। দিব্যেন্দু ভুরু কোঁচকাল। সুমিত্রাও বক্রগ্রীব হয়ে বিরূপের

দিকে তাকাল। কিন্তু ললিতবাবু গর্বের সঙ্গে বললেন, 'এত অল্প সময়ে এত উন্নতি সচরাচর দেখা যায় না। আর কিছুদিন নমিতা যদি এইভাবে খাটে আমার মনে হয়—।'

নমিতা বাধা দিয়ে বলল, 'সবই আপনার দয়া।' তার মাথাটা হেঁট হতে কাল চুলের মাঝখানে সিঁথিটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

আট

'এত লোক পারছে আর তুমি পারবে না?' বিভূতি বেশ রেগেই বলল।

বিরূপ শান্ত ও সরলভাবে বলল, 'দশটা-পাঁচটা মানে দিনে সাত ঘণ্টা।'

—'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সাত ঘণ্টা তো দেখতে দেখতে কেটে যায়। দিনে ঘুমোও ক-ঘণ্টা?'

—'তা বললে কি হবে? তোমায় তো দেখছি—যতক্ষণ জেগে আছ ততক্ষণই আপিস। দাড়ি কামান, নাওয়া-খাওয়া, বাসে-ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া-আসা, আর কালকের ভাবনা ভাবতে-ভাবতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া—এই সব মিলিয়ে ক-ঘণ্টা আপিস হয় বল।'

বিভূতি বোঝাতে পারল না যে এর নামই কর্মজীবন।

তার আপিসে কেরানীর চাকরি খালি হয়েছে। আজ চাউর হলে কালই হয়ত দশ হাজার দরখাস্ত দাখিল হবে। দুর্মূল্যের

বাজারে এ হেন চাকরি যাতে তার ভাইয়ের জন্যে বরাদ্দ থাকে বিভূতি সে জন্যে তদবির করতে কসুর করেনি। বড় সাহেব খাঁটি স্কচ। তাঁকে শেষ পর্যন্ত রাজী করাতে পারবে তাতো ভাবতেই পারেনি বিভূতি।

অনেক আশা করে বিভূতি হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছিল সুখবরটা নিয়ে। চাকরি তো হয়েই গিয়েছিল শুধু একটা দরখাস্ত পেশ করতে যা দেরি।

খবর শুনে হেমাঙ্গিনী আশীর্বাদ করেছিলেন বিভূতিকে। সুনীলা আর মায়ারও আনন্দের সীমা নেই। সকলে উৎকণ্ঠিত বিরূপ খবরটা পেয়ে কী বলবে—তার মুখের চেহারা কী রকম হবে!

কিন্তু বিরূপ যে এক কথায় হাতের লক্ষী পায়ে ঠেলে ফেলে দেবে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। চরম আঘাত পেয়েছিল বিভূতি। বিরূপকে কিছুতে রাজী করাতে না পেরে শেষকালে বলল, 'বেশ, তোমার যা ভাল লাগে তাই কর। চাকরি করতে না চাও ব্যবসা কর, ওকালতি কর, যা হয় একটা কিছু কর।'

বিরূপ ছেলেমানুষের মত আব্দারের স্বরে বলল, 'এমন কিছু করা যায় না যাতে আরও কিছুদিন রোজগার না করে কাটান যায়?'

বিভূতি না হেসে পারল না। খানিকক্ষণ ভেবে বলল, 'আসছে বছর বি-সি-এস দিতে চাও তো বল। সে চাকরি যদি পছন্দ হয় তবে আদাজল খেয়ে লাগো। একটা চান্সই পাবে হয়ত।'

বিরূপ হেসে বলল, 'তাই লাগব। কিছুদিনের জন্যে তুমি যে আমায় দুর্ভাবনার হাত থেকে রেহাই দিলে এতেই আমি খুশি।'

বিরূপের বি-সি-এস পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থাটা হেমাঙ্গিনীর আদৌ পছন্দ হয়নি। সন্ধ্যাবেলা পূজোআচ্চা সেরে ফুরসৎ পেলেন মনের ভার নামাবার। নিজের খাটে দুই নাতিকে আড়াআড়ি

শুইয়ে তাদের পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে অনেকক্ষণ বকর বকর করলেন সুনীলা আর মায়ার সঙ্গে। তারা দুজনে মাদুর পেতে বসে পান সাজছিল। হেমাঙ্গিনীই বলে যাচ্ছিলেন, তারা শুধু এক একবার সাড়া দিচ্ছিল। অবশেষে হেমাঙ্গিনী চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বললেন এ সবই তাঁর পূর্বজন্মের কর্মফল—নারায়ণের মনে কী আছে তিনিই জানেন।

সুনীলা সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। ঠাকুরপো বি-সি-এস পাশ করে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবে এই বোধ হয় তাঁর ইচ্ছে।'

মায়া ফোড়ন কেটে বলে উঠল, 'হুঁঃ। ছোড়দা বি-সি-এস পাশ করবে না ছাই করবে। আর যদিও বা করে, চাকরি করতে পারবে ভেবেছ?'

সুনীলার চাকুরে স্বামী। বুড়ো আঙুল দিয়ে পানের ল্যাজটা পটাশ করে মুড়ে বলল, 'কেন? না পারার কী আছে?'

—'ও বাবা, ঘড়ি ধরে কাজ ছোড়দা করবে? তার ওপর মফস্বলে? কী রকম বড় বড় মশা! মাকে জিজ্ঞেস করে দেখ না! না মা? কোথায় যেন বাবা মশারির ভেতর বসে কাজ করতেন?'

—'পার্বতীপুরে।'

—'ঐ শোনো। তার ওপর আদ্ধেক জায়গায় আলো-পাখা নেই।'

সুনীলা ভুল সংশোধন করে বলল, 'এখন অনেক ছোটখাট সহরেও ইলেকট্রিক লাইন বসেছে।'

হেমাঙ্গিনী বললেন, 'এমনিতেও জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের বাংলায় টানা-পাখা থাকে।'

মায়া হঠবার মেয়ে নয়। বললে, 'তোমরা যাই বল বি-সি-এস, ফি-সি-এস ছোড়দার জন্যে নয়। তার চেয়ে বড়লোক

শ্বশুর দেখে সম্বন্ধ খোঁজ—কথা থাকবে শ্বশুর বিলেত পাঠিয়ে হোক, যে করে হোক জামাইকে দাঁড় করাবার ভার নেবে।'

হেমাঙ্গিনীর শীর্ণ ঠোঁটে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল। এই মায়াই একদিন তার ছোড়দার সঙ্গে নমিতার বিয়ে দেবার জন্যে কেঁদে বাড়ি ভাসিয়ে দিয়েছিল। সে যাই হোক, মায়ার প্রস্তাবটা ফেলনা নয়। হেমাঙ্গিনী ভেবে দেখলেন যে বৃক্ষ হইতে বীজের মতন বিয়ে থেকে চাকরিও হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ল নন্দঘটকীকে। বিভূতির বিয়ে সে-ই দিয়েছিল। অবশ্য পাত্র হিসেবে বিভূতির দাম তখন বিরূপের চেয়ে অনেক বেশী। পাত্র নিজে চাকুরে। আর পাত্রের পিতা সবজজিয়তি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও তখন জীবিত।

খবর দিতে, দু-একদিনের মধ্যেই নন্দঘটকী এসে হাজির হল। হেমাঙ্গিনী জানালেন তাঁর মনের কথা। ইতস্ততঃ করে বললেন, 'অমন সম্বন্ধ কি পাওয়া যাবে?'

নন্দঘটকী গালে হাত দিয়ে থেবড়ে বসে পড়ল। চোখ ড্যাবড্যাব করে বলল, 'সে কী কথা গো! অমন সোনার-চাঁদ ছেলে। পাঁচ পাঁচটা পাশ। মেয়ের বাপেরা শুনলে তোমায় তিষ্ঠোতে দেবে ভেবেছ? দুবেলা এসে ধন্না দেবেনা তোমার বাড়িতে?'

হেমাঙ্গিনীর মনে বল এল। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলেন নন্দঘটকীর হাতযশকে। তাঁর মনে হল বিরূপের বিয়েটা যেন পাকাপাকিই স্থির হয়ে গেল। আশায় আশায় তিনি দিন গুনতে লাগলেন।

মানুষ-গেজেটের মধ্যে ঘটকী অন্যতম। তবে মৌখিক সংবাদ-প্রচারের বিপদ হল এই যে সংবাদের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে কোন ভরসা থাকে না। তার কারণ, কান থেকে মুখ অনেকটা পথ—তার মাঝখানে মস্তিষ্ক। কাজেই কয়েকটা দুষ্ট মাথার খুলির ভেতর দিয়ে যাতায়াত করার পর কোনও সংবাদ অজ্ঞাতকুলশীল হয়ে গেলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বিরূপের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এমনি একটা গোলযোগের সৃষ্টি হল। রটে গেল বিরূপ কোন এক বিত্তশালী ভদ্রলোকের একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করে শ্বশুরের পয়সায় বিলেত যাচ্ছে জার্নালিসম শিখতে। কথাটা এক বন্ধুর মারফত শুধু যে বিরূপের কানে পৌঁছল তা নয়, কচিমামাও সেই খবর পেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলেন হেমাঙ্গিনীর কাছে যাচিয়ে নিতে। আনন্দের কথা। কিন্তু বাড়িশুদ্ধু লোক অবাক। নন্দঘটকীর পাত্তা নেই অথচ সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেল এই বা কেমন ঘটকালি?

এর মাঝখানে হঠাৎ একদিন নমিতা এসে হাজির। মায়া অবাক আর খুশি দুই-ই হল অনেকখানি। কিন্তু ছেড়ে কথা কইল না। বললে, 'বড় গাইয়ে হয়েছে বলে বুঝি আর মাটিতে পা পড়ছে না?'

নমিতার মুখে লজ্জার আভা ঝিলিক দিল। ধরে নিল বিরূদা সেদিন তার গান শুনে বাড়িতে এসে পঞ্চমুখ হয়ে

থাকবেন। বলল, 'বিরূদার কথা ছেড়ে দাও। সব কথা একটু বাড়িয়ে বলেন।'

—'বিরূদা?' মায়া আকাশ থেকে পড়ল। নমিতার সম্বন্ধে কোন কথাই বিরূপ বলেনি বাড়িতে। তার গানের সুখ্যাতি এমনিতেই ছড়িয়েছিল। কিন্তু মায়া এবার ছাড়ল না নমিতাকে। সব কথা খুঁটিয়ে বার করলে তাকে জেরা করে।

নিজেকে সামলাতে গিয়ে নমিতা তুলল সুমিত্রার কথা। বললে, এমন বেহায়া মেয়ে দেখা যায় না। পয়সার জোর খাটাতে চায় সর্বত্র। এমনকি সেদিন যাবার সময় জোর করে বিরূপকে টেনে নিয়ে গেল তাদের গাড়িতে, বাড়িতেও নাকি যাবার জন্যে সাধাসাধি করেছিল।

মায়া মুচকে মুচকে হাসতে লাগল। শেষকালে বলল, 'তাই বল। এতক্ষণে বোঝা গেল।'

নমিতা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'কী?' তার ভয় হল বুঝি বা কোন কথা বেফাঁস বলে ফেলেছে সে। হয়ত মায়া উলটো বুঝেছে।

মায়া হাসতে হাসতে বলল, 'গুজব উঠেছে যে ছোড়দা এক বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে বিলেত যাচ্ছে।'

—'ও তাই নাকি! সে তো খুব ভাল কথা।'

নমিতার দেরি হয়ে গিয়েছিল। যাবার জন্যে ব্যস্ত হল। আর একটু হলে আসল কথাটাই ভুলে গিয়েছিল। সে এসেছিল মায়াকে নেমন্তন্ন করতে তার গান শোনবার জন্যে। কোন এক বড় জলসায় ললিতবাবু তাঁর স্কুলের তরফ থেকে একটি অনুষ্ঠানের ভার নিয়েছিলেন—তার মধ্যে প্রধান অংশ ছিল নমিতার।

দুখানা কার্ড মায়ার হাতে দিয়ে নমিতা চলে গেল। মায়া কিছুক্ষণ কী ভেবে বিরূপের ঘরে গিয়ে কার্ড দুটো তার পড়ার টেবিলের উপর চাপা দিয়ে চলে এল।

বিরূপ বাড়ি ছিল না। বন্ধুর কাছে বিয়ের গুজব শোনার পর থেকে অস্থির হয়ে উঠেছিল তার মন। এমন একটা কাজ কি মা আর দাদার দ্বারা সম্ভব? তাহলে এই কি তার মা ও দাদার ধারণা যে সে সত্যিই পঙ্গু? নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে অক্ষম? এই জন্যেই কি ষড়যন্ত্র করে তাকে এক বড়লোক শ্বশুরের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা? টাকা দিয়ে চাকার কাজ?

লক্ষ্যহীন ভাবে বিরূপ সারাটা দিন ঘুরল। ক্লান্ত হয়ে যখন বাড়ি ফিরল, সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। চুপি চুপি নিজের ঘরে গিয়ে আলো না জ্বেলেই শুয়ে পড়ল।

বিরূপের ঘরের পাশেই ছোট বারান্দা। বারান্দা পার হলে হেমাঙ্গিনীর পূজোর ঘর। হেমাঙ্গিনী পূজো সেরে ফেরবার পথে বিরূপের ঘর অন্ধকার দেখে কাকে যেন জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে, বিরূ ফেরে নি?'

মায়ার গলা শুনতে পাওয়া গেল—'কই? ঘর ত অন্ধকার!'

—'তবে যে একটু আগে বৃন্দাবন বললে ছোটদাদাবাবু এসেছেন।'

—'কী জানি, হয়ত এসে আবার বেরিয়েছে।' বলে মায়া সদ্য-আবিষ্কৃত গুপ্তকথাটা মাকে বলবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল। —'জান মা, নমিতার কাছে শুনলুম ছোড়দার সত্যি নাকি এক মস্ত বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে বিরূপের ঘরে আলো জ্বলে উঠল।

মায়া অপ্রস্তুত হয়ে ঘরে ঢুকে বলল, 'ওমা! তুমি অন্ধকার ঘরে শুয়েছিলে!'

বিরূপ কোন কথা না বলে টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পাতা খুলল। হেমাঙ্গিনী একবার ঘরে ঢুকে বিরূপের শারীরিক কুশল জেনে, কপালে হাত দিয়ে চলে গেলেন। মায়া অপরাধিনীর মত দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বলল,

'বড়লোকের মেয়ের কথা বললুম বলে রাগ করলে? নমিতা ঠাট্টা করে বলছিল। তুমি সেদিন ওর গান শুনে সুখ্যাতি করে এসেছ বলে বেচারীর কত আনন্দ। আবার কোন জলসায় ওর গান হবে, তাই নেমন্তন্ন করতে এসেছিল তোমাকে আর আমাকে। যাবে? কার্ড ছুটো টেবিলের ওপরই আছে।'

বিরূপ কোন কথা বলল না। চেয়েও দেখল না কার্ড ছুটো আছে কি নেই।

তাচ্ছিল্য সহ্য করার মেয়ে মায়া নয়। সঙ্গে সঙ্গে কোমরে হাত দিয়ে ঝাঁঝাল স্বরে বলে উঠল—'কথা না বল বয়েই গেল। অমন বড়লোকের হবু জামাই আমি ঢের দেখেছি।' বলেই মুখ ঘুরিয়ে সশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিরূপ রেগে মেগে উঠে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে একেবারে খিল এঁটে দিল।

দশ

ভাইবোনের ঝগড়া ঝগড়াই নয়। কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপও বেরোয়। হঠাৎ একদিন ছুপুরে সেই কথাই প্রমাণ হল, যখন দেখা গেল বিরূপ মেঝের ওপর বসে নিজের বাক্স-বিছানা গোছাচ্ছে।

হেমাঙ্গিনী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। সুনীলাও তাই। বিরূপকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতেও তাঁদের ভয় হতে লাগল। হেমাঙ্গিনী বিভূতির আপিসে লোক পাঠাচ্ছিলেন, এমন সময় মায়া কলেজ থেকে ফিরল। তিনজনের পরামর্শে এই স্থির হল যে বিরূপকে স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞেস করা দরকার যে সে কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথায় যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে এবং কেন। হেমাঙ্গিনীকে এগিয়ে দিয়ে সুনীলা আর মায়া পেছন পেছন চলল। বিরূপের ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে হেমাঙ্গিনী একবার দম নিলেন। তারপর কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কিরে, কোথায় যাচ্ছিস?'

বিরূপ তিনজনের মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে মুচকি হাসল। জবাব দিল, 'চাকরি করতে।'

—'চাকরি করতে? বলিস কী?' হেমাঙ্গিনীর বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। তিনি তাড়াতাড়ি গিয়ে বিরূপের খাটের ওপর বসে পড়লেন। সুনীলা শ্বাশুড়ীর অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে ছুটে গিয়ে জল নিয়ে এল তাঁর ঘটিতে। পাখাটাও পুরোদমে চালিয়ে দিল। হেমাঙ্গিনী একটু সুস্থ হলেন। কিছুক্ষণ পরে বিরূপকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাকরি? বিভূকে বলেছিস?'

—'না। আজ চিঠি পেলাম যে পত্রপাঠ আমায় রওনা হতে হবে।'

—'কোথায়?'

—'মেদিনীপুরে। স্কুলমাস্টারের চাকরি—স্কুলটা ভাল।'

—'হরিবোল। এই চাকরির জন্যে তোমায় ঘরবাড়ি ছেড়ে আজই চলে যেতে হবে?'

মায়ার চোখ ছলছল করে উঠল। বললে, 'ছোড়দা আমার ওপর রাগ করে এই চাকরি নিয়েছে। বেশ—আমিও এর শোধ নিতে জানি।'

একমাত্র সুনীলাই কোন খেদ প্রকাশ করল না। উলটে বলল, 'এ সুখবরটা তুমি আগে দাওনি কেন ঠাকুরপো? আজ তোমার জন্যে তাহলে মাছের মুড়ো আনাতুম। কটায় ট্রেন তোমার? খেয়ে যাবে তো?'

বিরূপের মুখে হাসি ফুটল। বললে, 'রাত্তিরে ট্রেন। সন্ধ্যেবেলা খেয়ে যাব। মাছের মুড়ো না খাওয়াও, ভাল করে মাছের ঝোল রেঁধে খাইও। আবার কবে তোমার হাতের রান্না খাবার সৌভাগ্য হবে কে জানে!'

হেমাঙ্গিনী গজগজ করতে করতে উঠে পড়লেন—'বিরূকে ঘরছাড়া করতে বৌমার দেখছি আর তর সইছে না। যা ইচ্ছে হয় কর তোমরা। বিভূ এসে সামলাক তার সংসার। আমি কালই কাশী চলে যাব। আমারই বা এত মায়া কিসের?'

মায়াও এবার কান্না চাপবার জন্যে ঘর থেকে চলে গেল। সুনীলা পেছন পেছন গেল তাকে বোঝাতে।

আপিস থেকে ফিরে বিভূতি অনেক চেষ্টা করল বিরূপের মত বদলাবার। বিরূপ অটল। শেষে ব্যর্থ হয়ে বিভূতি মাকে গিয়ে বলল, 'ওর রাগের কারণটা তো বুঝতে পারলুম না। যাই হোক, শখ যখন হয়েছে কিছুদিনের জন্যে ঘুরে আসুক। তবে চাকরির সঙ্গে সঙ্গে বি-সি-এস-এর পড়াটাও যাতে পড়ে তা অনেক করে বলে দিলুম। এখন ওর বরাত।'

বিভূতি স্টেশনে গেল বিরূপকে ট্রেনে তুলে দিতে। এই ওর প্রথম বিদেশ যাত্রা। প্রথম চাকরিও বটে। নানা উপদেশ দিল বিভূতি সর্ববিষয়ে। বাড়ি ফিরে এসে দেখল হেন প্রাণী নেই যে মুষড়ে পড়েনি।

* বিভূতি আজ যেন নতুন করে উপলব্ধি করল যে এ সংসার তার একার নয়।

সেদিন স্কুলে নমিতার গান শুনে ললিতবাবু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। শিল্পীর মানসিক অবস্থাভেদে শিল্পের কতদূর তারতম্য ঘটতে পারে তা যেন নমিতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ললিতবাবু তাই বিরূপকে নেমন্তন্ন করেছিলেন জলসায়—বিশেষ করে নমিতার গান শোনবার জন্যে।

তর্ক উঠতে পারে যে সঙ্গীতশাস্ত্রে অজ্ঞ বিরূপ, যে সমঝদার শ্রোতা নয়, সে কেমন করে শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করবে? কিন্তু ললিতবাবুর মতে সমঝদার শ্রোতার প্রয়োজন, যেখানে সঙ্গীত বহির্মুখী। সঙ্গীতকে অন্তর্মুখী করতে গেলে শুধু প্রেরণাই যথেষ্ট। সে প্রেরণা যে শ্রোতাই দিন না কেন তিনিই আদর্শ শ্রোতা।

ললিতবাবু নমিতার দিকটা অবশ্য ভেবে দেখেন নি। তার হাত দিয়ে কার্ড পাঠালেও বুঝতে পারেন নি যে নমিতা বিরূদার আসবার কথা মুখ ফুটে বলতে পারবে না। নেমন্তন্নটা উহ্য রেখে চলে আসবে।

জলসা আরম্ভ হয়ে যাবার পরও মায়া বা বিরূপ কাউকে না দেখতে পেয়ে ললিতবাবু নমিতাকে একবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘বিরূপবাবুকে ভাল করে বলে এসেছিলে তো?’

নমিতা মিথ্যে করে ঘাড় নাড়ল। কিন্তু তার সন্দেহ হল,

বিরুদার কথা মায়াকে বলে আসেনি বলে কি মায়া সত্যিই বলেনি বিরুদাকে ?

যথা সময়ে নমিতার গানের পালা এল। নমিতা স্টেজে বসে দু-একবার এধার ওধার খুঁজে দেখল কোথাও চেনা মুখ দেখা যায় কিনা। শুধু দিব্যেন্দুকে সে দেখতে পেল—সামনের পঙ্‌ক্তিতে বসে আছে গালে হাত দিয়ে।

নমিতা গান শুরু করল।

ললিতবাবু সকল ছাত্রীকেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে অনুষ্ঠানের সাফল্যের ওপর শুধু তাদের নয়, স্কুলের সুনাম ও গৌরবও নির্ভর করছে। এবং নমিতা যে তাঁর সব চেয়ে বড় ভরসা এও তিনি ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হন নি।

এই দায়িত্বের কথা সর্বক্ষণ মনে রাখা সত্ত্বেও নমিতা আজ বারে বারে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল—হারিয়ে ফেলছিল গানের সঙ্গে প্রাণের সংযোগ। তবু শিক্ষা আর অভ্যাসের গুণে সে যা গাইছিল তাই শুনেই থেকে থেকে বাহবা দিচ্ছিলেন শ্রোতারা।

শেষ অবধি অনুষ্ঠানটি ললিতবাবু ও তাঁর স্কুলের গৌরব বৃদ্ধি করল যথেষ্ট এবং নমিতার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল এ কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেন।

অনুষ্ঠানের শেষে ছাত্রীদের আর বাজনাগুলো পৌঁছে দেওয়া এক পর্ব। কিছু সুমিত্রাদের গাড়িতে কিছু ট্যাক্সিতে পাঠিয়ে আরও একটা ট্যাক্সি করতে হল। দ্বিতীয় ট্যাক্সিতে তানপুরা, হারমোনিয়ম এবং সেই সঙ্গে নমিতা ও একটি ছাত্রীকে তুলে ললিতবাবু সামনের সিটে বসতে যাবেন এমন সময় দিব্যেন্দু ছুটে এল। 'যায়গা হবে ?' বলে সে একরকম জোর করেই ললিতবাবুর

পাশে ঠেলাঠেলি করে বসে পড়ল। দিব্যেন্দুদের বাড়ি উলটো পথে। ললিতবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এদিকে কোথায় ?'

'চলুন না।' বলে দিব্যেন্দু অকারণ হাসল। ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

স্কুলের সামনে ট্যাক্সি থামতে দিব্যেন্দু আস্তিন গুটিয়ে হারমোনিয়মটা ওপরে পৌঁছে দিয়ে এল। ললিতবাবু সাবধানে নিয়ে গেলেন তানপুরাটা বুকেকোলে করে।

ট্যাক্সি ললিতবাবুর নির্দেশমত অন্য ছাত্রীটিকে নামিয়ে দিয়ে মোড় ঘুরল নমিতাদের বাড়ির দিকে। এতক্ষণে দিব্যেন্দু তার মনের কথা ভাঙ্গল। বললে, 'ভাবছি, নমিতার মার সঙ্গে আলাপ করে আসব। আপত্তি আছে ?'

কার আপত্তি বোঝা গেল না। নমিতা অস্বস্তি বোধ করল। বললে, 'এতে আপত্তির কী আছে ?'

পথে আর কোন কথা হল না।

নমিতাদের বাড়ির সামনে ললিতবাবু ট্যাক্সি দাঁড় করাতে দিব্যেন্দু তাড়াতাড়ি ভাড়া চুকিয়ে দিল। ললিতবাবুর বারণ সে মানল না। ললিতবাবু একটু অবাক হলেন। আজ যেন দিব্যেন্দুকে অন্য রকম লাগছে। খানিকটা বেপরোয়া খানিকটা নায়কীয়।

যে বাড়িটা নমিতাদের বলে জানা গেল তার দৈন্যদশা রাত্তিরেও চোখে পড়ে। সদর দরজা বন্ধ ছিল। ঠেলাঠেলি না করে নমিতা পাশ দিয়ে একটা সরু পথের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই ভেতর থেকে দরজা খুলে বললে, 'আসুন।'

ঢুকেই বৈঠকখানা। একদিকে তক্তপোশ, অন্যদিকে ছোট টেবিল, তার জুড়ি একখানি চেয়ার। দিব্যেন্দু আর ললিতবাবুকে বসতে বলে নমিতা ভেতরে চলে গেল।

দিব্যেন্দু মাথা ঘুরিয়ে চারিদিক দেখতে লাগল। রেল লাইনের মত কড়িকাঠ, খড়খড়ির অনেক পাখির ডানা ভাঙ্গা, অনেক শার্সির আবরু নেই। দেয়ালে দুখানি গ্রুপ ফোটো জণ্ডিস রোগে আক্রান্ত, একটি চা-কোম্পানীর বিজ্ঞাপনভূষিত বাংলা-ইংরেজী ক্যালেণ্ডার। দিব্যেন্দু শেডবিহীন বাল্বটার দিকে তাকিয়ে ভাবল তার পাওয়ার কত হতে পারে—পনের না পঁচিশ? একবার তক্তপোশের ওপর শতরঞ্জিটা দেখল। জগতের শ্রেষ্ঠ কারিগরকে দেখালে সে কি বলে দিতে পারবে শতরঞ্জির আসল রূপ কী ছিল যা দেখে তাকে ঘরে আনা হয়েছিল?

টেবিলের ওপর হাঁটুর ঠেকা দিয়ে ললিতবাবু চেয়ারে বসে বসে দিব্যেন্দুকে লক্ষ করছিলেন। নমিতার মার সঙ্গে আলাপ করার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে দিব্যেন্দুর? নমিতারা ব্রাহ্মণ, দিব্যেন্দুরা কায়স্থ। দিব্যেন্দুর বাবাকে ললিতবাবু ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। তিনি অন্ততঃ নমিতাকে পুত্রবধূ করবেন না এতে কোন সন্দেহ ছিল না। দিব্যেন্দু কী চায় তবে?

ললিতবাবু ভাবছিলেন কথাটা ঘুরিয়ে পাড়বেন কিনা, এমন সময় নমিতার মা ঘরে ঢুকলেন। মনে হল কিছু একটা কাজ ফেলে উঠে এসেছেন। ময়লা, জীর্ণ ধুতির আঁচলে হাত মুছে তিনি ক্ষীণ হাসি হেসে দিব্যেন্দুর দিকে তাকালেন। দিব্যেন্দু উঠে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

—'বেঁচে থাকো বাবা।'

ললিতবাবু দিব্যেন্দুর পিতৃপরিচয় দিয়ে বললেন, 'দিব্যেন্দুর বোন সুমিত্রা আমার ছাত্রী। আমার স্কুলের উন্নতির জন্যে পরিতোষবাবু সুমিত্রাকে আমার স্কুলেই ভরতি করিয়েছেন, নইলে আমার মতন দশবিশটা গানের মাষ্টারকে বাড়িতে এনে মেয়েকে গান শেখানর ক্ষমতা তাঁর আছে।'

নমিতার মা যেন একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। দিব্যেন্দুর চেহারা দেখেই তার আর্থিক অবস্থার খানিকটা আন্দাজ তিনি পেয়েছিলেন। ললিতবাবুর কথা শুনে বুঝলেন তাঁর অতিথি মস্ত বড়লোকের ছেলে। ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'তুমি বোসো বাবা। আমি দেখি নমি কোথায় গেল।' বলে তিনি ভেতরে যাচ্ছিলেন, দিব্যেন্দু বাধা দিল।—'আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

নমিতার মার বুকটা কেঁপে উঠল। নমিতার এক বন্ধুর দাদা তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে শুনেই তিনি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। যা অসম্ভব তার চিন্তাকেও তিনি প্রশ্রয় দেননি। তবে আবার দিব্যেন্দু কী বলতে চায়?

দিব্যেন্দু মাথা নীচু করে বলল, 'জানিনা আপনি শুনে কী বলবেন। কিন্তু আমি এসেছিলাম আপনাকে বলতে যে আমি নমিতাকে বিয়ে করতে চাই।'

নমিতার মা আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে আঁচল তুলে ধরলেন চোখের ওপর। একটু পরে বললেন, 'দেখছ তো বাবা আমাদের অবস্থা। এ বাড়ির মেয়ে কি তোমাদের মত বড়লোকের ঘরে মানাবে?'

—'সে দায়িত্ব আমার। আমি শুধু আপনার কাছে অনুমতি চাইছি।'

ললিতবাবু উসখুস করছিলেন। বলে উঠলেন, 'কিন্তু, তোমরা তো কায়স্থ! এঁরা ব্রাহ্মণ। এঁদের আপত্তির কথা বাদ দিলেও তোমার বাবা কি এ বিয়েতে রাজী হবেন?'

—'না। সেইজন্যে আমি তাঁকে না জানিয়ে বিয়ে করতে চাই।'

নমিতার মার মুখ শুকিয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তা কি হয় বাবা? কতদিন আর লুকিয়ে রাখবে? তোমার বাবা একদিন না একদিন জানতেই পারবেন। তখন কী করবে ভেবে দেখেছ?'

দিব্যেন্দু খানিকটা দম্ভের সঙ্গে উত্তর দিল—'তখন যাই করি—আপনার মেয়েকে জলে ফেলে দেব না নিশ্চয়।'

নমিতার মা হতবুদ্ধি হয়ে ললিতবাবুর দিকে তাকালেন। তিনি মা। মেয়ের কী ভাল কী মন্দ তা বিচার করা যেন তাঁর পক্ষে অসাধ্য হয়ে দাঁড়াল যেমন ডাক্তারের অসাধ্য হয় নিজের সন্তানের চিকিৎসা করা।

ললিতবাবু বুঝতে পারলেন নমিতার মার অবস্থা। বললেন, 'তুমি কিছু মনে কোরনা দিব্যেন্দু! জলে ফেলে না দিলেই মানুষ বেঁচে যায় না। তুমি এখনও ছেলেমানুষ, সব দিক বোধ হয় ভাল করে ভাবনি। যেমন ধর, লুকিয়ে বিয়ে করলে তার কী কী ফলাফল হতে পারে, এবং ভগবান না করুন বাবার সঙ্গে যদি তোমার মনোমালিন্য ঘটে তখন তুমি কী করে তোমাদের খরচ চালাবে, ইত্যাদি। তাই আমি বলি, তুমি তোমার বাবাকে আগে তোমার মনের কথা খুলে বল। তারপর ভেবে দেখো তোমার পক্ষে নমিতাকে বিয়ে করা সম্ভব কিনা।'

দিব্যেন্দু বিরক্ত হল। ললিতবাবুর কথাগুলো তার কানে অযাচিত উপদেশের মত শোনাল। বললে, 'ক্ষমা করবেন। আপনার উপদেশ মেনে চলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

—'তাহলে কী করতে চাও তুমি ?'

দিব্যেন্দু ললিতবাবুকে উপেক্ষা করে নমিতার মার দিকে ফিরে বলল, 'যদি আপনাদের মত থাকে তবে আমি দু-চারদিনের মধ্যেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চাই, কারণ দেরি হলে অনেক বাধার সৃষ্টি হতে পারে।'

নমিতার মা কোন জবাব দিতে পারলেন না। ললিতবাবুও চুপ করে আছেন দেখে তিনি শেষে বললেন, 'তুমি একটু বোসো বাবা। আমি নমিতার মামাকে ডেকে আনি। তিনিই এ বাড়ির কর্তা।' বলেই তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

ললিতবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে লাগলেন। দিব্যেন্দুর ঔদ্ধত্যের কোন মানে খুঁজে পেলেন না তিনি। তার বাবার ব্যবসা কিছু কিছু দেখলেও দিব্যেন্দু যে আত্মনির্ভর নয় ললিতবাবু তা জানতেন। তবে কোন সাহসে সে নমিতাকে বিয়ে করতে চায়? এ কোন ধরনের জুয়া খেলা? ললিতবাবুর প্রবৃত্তি হচ্ছিলনা এ নিয়ে দিব্যেন্দুর সঙ্গে দ্বিতীয়বার আলোচনা করবার। কিন্তু তাঁর দুঃখ হতে লাগল নমিতার জন্যে—সঙ্গীত-প্রতিভার স্ফুরণের মুখে এই বিয়ের জন্যে হয়ত তার সব আশা, সব পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যাবে!

—'দেখ দিব্যেন্দু', ললিতবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাই আবার বললেন, 'তুমি নমিতাকে বিয়ে করতে চাইছ, নিশ্চয় তার প্রধান কারণ নমিতার গান তোমার ভাল লাগে। কিন্তু বিয়ের পর নমিতাকে যদি আত্মগোপন করে থাকতে হয়, যদি সে তোমার স্ত্রী বলে পরিচয় না দিতে পারে, যদি সে গানই না গাইতে পারে, যদি তার সঙ্গীত-সাধনার সব আশা নির্মূল হয়ে যায়, তাহলে তোমাদের বিয়ের সার্থকতা কোথায় রইল আমি তো বুঝতে পাচ্ছি না।'

দিব্যেন্দুর মুখচোখ কুৎসিতভাবে কুঁচকে উঠল। কোন কুণ্ঠা না করেই সে বললে, 'নমিতার গান শেখা বন্ধ হলে নমিতার চেয়ে আপনারই বেশী ক্ষতি হবে বলে মনে হচ্ছে।'

ললিতবাবু হতভম্ব হয়ে গেলেন। রাগে, দুঃখে, অপমানে তাঁর শরীর রি রি করে উঠল। আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে তিনি সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন অন্ধকার রাস্তার দিকে।

ললিতবাবুকে আঘাত দেবার যে প্রচণ্ড বাসনা দিব্যেন্দুকে পেয়ে বসেছিল তা মিটে যেতে তার অনুতাপ হতে লাগল। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলতে পারবেন যে মন থেকে উত্তাপ বেরিয়ে যাবার পর যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তার নাম অনুতাপ কিনা।

দিব্যেন্দু অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তার চমক ভাঙল একজোড়া ভারি পায়ের চটির শব্দে। বুঝল নমিতার মামা সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। দিব্যেন্দু সোজা হয়ে বসল। নমিতার মামা একটু পরেই ঘরে ঢুকলেন—পেছনে নমিতার মা। দিব্যেন্দু তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে নমিতার মামাকে প্রণাম করল।

ললিতবাবুকে দেখতে না পেয়ে নমিতার মা প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন তাঁর কথা। দিব্যেন্দু মিথ্যে কথাটা মিষ্টি করে বলল, 'হঠাৎ কী কাজের কথা মনে পড়ায় তিনি চলে গেলেন, বলে গেলেন কাল আসবেন।'

নমিতার মামার নাম ভূপতিবাবু। মোটাসোটা, বেঁটেখাটো ভদ্রলোক। চেয়ারের ওপর যখন পা দুটো তুলে বাবু হয়ে বসলেন বোঝা গেল যে তাঁর শরীরের অনুপাতে চেয়ারখানি ছোট।

কথাটা নতুন করে পাড়লেন নমিতার মা। ভূপতিবাবু পৈতেটা সোজা করতে করতে বললেন, 'আমার যে রকম অবস্থা, তাতে এঁর মতন পাত্রের সঙ্গে নমির বিয়ে দিতে পারব এ তো কখন স্বপ্নেও ভাবিনি।'

নমিতার মা বললেন, 'কিন্তু—।'

—'কিন্তু একটা নয়, অনেক। তাহলেও বাবাজী যখন সব জেনেশুনে বিয়ে করতে চাইছে, আমিই বা 'না' বলি কী করে বল্।'

নমিতার মা তবুও মনে করিয়ে দিলেন—'জানাজানি হবেই, আজ না হয় কাল। তারপর?'

'তারপর আর কী? বাবা যদি বাড়ি থেকে তাড়িয়েই দেন বাবাজী না হয় আমার এখানে এসে থাকবে। কী বল বাবা? পারবে ত?'

ভূপতিবাবুর উদারতায় দিব্যেন্দুর মাথা হেঁট হয়ে গেল। মান বাঁচাবার জন্যে তাকে জোর করে বলতে হল, 'আমার জন্যে

আপনি ভাববেন না। যদি ভগবান বিপদেই ফেলেন, বিপদ থেকে উদ্ধারও করবেন তিনি।'

ভূপতিবাবু খুব খুশি হলেন দিব্যেন্দুর এ কথায়। বললেন, 'ঠিক বলেছ বাবা, এ সবই তিনি করাচ্ছেন—আমরা খালি সুতোবাঁধা পুতুলের মত হাত-পা নাড়ছি।'

বিয়ের কাজকর্মের কথা উঠতে দিব্যেন্দু বলল, 'রেজিষ্ট্রী করার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন। তবে লোকদেখান কুলাচার, আমার মতে, কলকাতার বাইরে কোথাও সেরে ফেলাই ভাল—আরও ভাল হয় যদি নমিতা আপাততঃ সেইখানেই থাকে।'

নমিতার মার মুখ ভার হয়ে উঠল। একটি মাত্র মেয়ে তাঁর। মেয়েকে সুখী করা ছাড়া আজ তাঁর অন্য কোন কামনা নেই। কিন্তু এ কেমন বিয়ে যে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশী কেউ আসবে না, জানবেনা, শাঁক বাজাবেনা, উলু দেবেনা। এই বিয়ের স্বপ্নই কি নমিতা এতদিন দেখে এসেছে?

তিনি ইতস্ততঃ করে বললেন, 'এ রকম ভাবে কি বিয়ে দেওয়া যাবে?'

ভূপতিবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমিও তাই ভাবছি। তবে একটা উপায় আছে। আমার মনে হয় তাতে কারুর কিছু বলবার থাকবে না।' এবার দিব্যেন্দুর দিকে ফিরে বললেন, 'দেখ বাবা, আমাদের দেশ হল বিষ্টুপুরে—সেখানে আমার সামান্য কিছু ভিটেমাটি আছে—আর আমার এক দূর সম্পর্কের বৌদি তিন-চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে অতি কষ্টে সেখানেই থাকেন। মাসে মাসে আমি কিছু পাঠাই তাই দিয়ে তারা যেমন করে হোক চালিয়ে নেয়। আমি বলি কি, তোমাদের বিয়েটা বিষ্টুপুরেই হোক আর বিয়ের পর নমি আর তার মা ওখানেই থাকুক—তুমি তাদের দেখাশুনো কোরো। তাহলে কলকাতায়

জানাজানিও হবে না—ওখানকার লোকেও সন্দেহ করবে না। আর যতদিন না বাবার মত পাও, তুমি না হয় মাঝে মাঝে বিষ্টুপুর ঘুরে এলে—কতটুকুই বা পথ!'

দিব্যেন্দু ঠিক এই রকমই কোন ব্যবস্থার কথা ভাবছিল। খুশি হয়ে বললে, 'বেশ—বেশ। এ খুব ভাল হল। আপনি বিয়ের দিন স্থির করে আমায় জানালেই আমি আর সব বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলব।'

নমিতার মার চোখ জলে ভরে উঠল। তাঁর মনে হল আজই যেন নমিতা জন্মের মত পর হয়ে গেল। আজ থেকে তার স্বামী আগে, মা পরে। তাড়াতাড়ি ঘোমটার পাশ টেনে তিনি ঘর থেকে চলে গেলেন।

নমিতার মাকে অমন ভাবে চলে যেতে দেখে ভূপতিবাবুরও গলা ধরে এল। দিব্যেন্দুকে বললেন, 'নমি আমার মেয়ের মতন। সে সুখে থাকবে এই আশাতেই এ বিয়েতে মত দিলাম। কিন্তু দেখো বাবা, পরে তোমার বাবা জানতে পারলে আমাদের না দোষ দেন যে আমরা তোমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে মেয়েকে গছিয়ে দিয়েছি। —আর তুমিও যত তাড়াতাড়ি পার, সবদিক গুছিয়ে নমিকে নিজের কাছে নিয়ে যেও। এর বেশী আর কী বলব?' বলে ভূপতিবাবু কোঁচার খুঁটটা খুঁজতে লাগলেন।

দিব্যেন্দু অনেকক্ষণ ধরে ভূপতিবাবুকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিল। টাকার ভাবনাও ভাবতে বারণ করে দিল তাঁকে, আর বারবার বলে দিল যেন ঘুণাক্ষরে খবরটা না বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বার

রাস্তায় নেমে দিব্যেন্দুর খেয়াল হল রাত অনেক হয়েছে। ঘড়িটা চোখের কাছে এনে দেখল প্রায় বারটা। বাড়ি ফেরার দুশ্চিন্তায় হনহন করে এগিয়ে চলল, যত তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায়।

কিছুদূর গিয়ে একটা রাস্তার মোড় ঘুরতে হঠাৎ দিব্যেন্দুর চোখে পড়ল রাস্তার নাম 'শ্রীহর্ষভূষণ লেন। নামটা খুব চেনা চেনা। একটু পরেই মনে পড়ল এই রাস্তায় ললিতবাবুর বাড়ি। ঠিকানাটা তার মনে ছিলনা, বাড়িও সে চিনত না, তবে রাস্তার নামটা যে এই তাতে কোন সন্দেহ ছিল না তার।

ললিতবাবুর কথা মনে হতেই নিজের দুর্ব্যবহারের জন্যে লজ্জা পেল দিব্যেন্দু। বিয়ে যখন ঠিকই হয়ে গেছে ললিতবাবুর কাছে ক্ষমা চাইলে তার মান বাড়বে বই কমবে না। তাছাড়া আরও একটা কথা তার মনে হল। ললিতবাবুকে দিব্যেন্দুর বাবা যথেষ্ট স্নেহ করেন। ললিতবাবুর বাবা দিব্যেন্দুদের বাড়ির ডাক্তার ছিলেন তার ঠাকুরদার আমল থেকে। সুতরাং ললিতবাবু ইচ্ছে করলে সব কথাই দিব্যেন্দুর বাবাকে বলে দিয়ে তাঁর অপমানের চরম প্রতিশোধ নিতে পারেন। দিব্যেন্দু তাই দোনামোনা করে শেষ অবধি ঠিক করল এই রাতদুপুরেই ললিতবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে যাবে।

বাড়ি খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হল না। খানিকটা যেতেই দিব্যেন্দুর কানে এলো ক্ষীণ সঙ্গীতের সুর—যেন কোন বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসছে। ললিতবাবু এত রাতে গান

গাইছেন? সুর অনুসরণ করে দিব্যেন্দু একটা একতলা বাড়ির রোয়াকের ওপর উঠে চিনতে পারল ললিতবাবুর গলা। করুণ ও শান্ত রস মিশিয়ে গাইছেন দরবারী কানাড়া। দিব্যেন্দু রোয়াকে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল ললিতবাবুর গান।

তানপুরা বন্ধ হতে দিব্যেন্দু দরজার কড়া নাড়ল। ললিতবাবু বেশ জোরেই সাড়া দিলেন, 'কে?' সম্ভবতঃ চমকে উঠেছিলেন। দিব্যেন্দু নাম বলতে ললিতবাবু তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'দিব্যেন্দু? তুমি? এত রাত্তিরে? এসো-এসো—কী ব্যাপার?'

দিব্যেন্দু ঘরে ঢুকতে ললিতবাবু তানপুরাটা মাদুর থেকে তুলে দেয়ালের কোণে রেখে এলেন। —'বোসো-বোসো।'

জুতো খুলে মাদুরের ওপর বসে পড়ল দিব্যেন্দু। —'কী ব্যাপার?' আবার জিজ্ঞেস করলেন ললিতবাবু।

দিব্যেন্দু বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'আমায় ক্ষমা করুন। আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না।'

ললিতবাবু মুচকি হাসলেন।

দিব্যেন্দু বলে চলল, 'আপনি হয়ত ভাবছেন নমিতাকে বিয়ে করা আমার এক গোঁয়ারতমি, কিন্তু গোঁয়ারতমি ছাড়াও তো কোন কঠিন কাজ করা যায় না! নেহাত গোঁ ধরেছিলুম বলেই শেষপর্যন্ত সকলের মত পেয়েছি। এখন আপনার মত পেলেই আমি এগোই।'

ললিতবাবু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সকলের মত পেয়েছ?'

—'হ্যাঁ। নমিতার মা আর নমিতার মামা দুজনেই মত দিয়েছেন।'

—'আর নমিতা?'

দিব্যেন্দু এ প্রশ্ন আশা করেনি। বললে, 'নমিতার মত নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনি। তবে আমার বিশ্বাস যে এ বিয়েতে তার অমত হবে না।'

ললিতবাবু কী ভাবলেন। তারপর বললেন, 'তা সত্যি, নমিতা প্রতিবাদ জানাতে শেখেনি, দাবি জানাতে শেখেনি। এমন মেয়েকে তুমি যদি বিয়ে করতে পার, প্রমাণ হবে যে তোমার মত ভাগ্যবান পুরুষ জগতে খুব কমই আছে।'

ললিতবাবুর কথাগুলো দিব্যেন্দুর কাছে খাপছাড়া লাগল। বলল, 'আমি বুঝতে পারছি যে আপনি চান না এ সময়ে নমিতার গান শেখা বা গান গাওয়ার ব্যাঘাত হোক। সে আপনার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্রী, আপনার স্কুলের গৌরব—সব সত্যি। কিন্তু ধরুন আজ যদি তার অন্য কোথাও বিয়ে হত—তাহলে আপনি তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যতখানি ভয় পাচ্ছেন তার চেয়ে বেশী দুরবস্থাও তো তার হতে পারত!'

ললিতবাবু উত্তর দিলেন না। কিন্তু বলতে পারতেন যে আর কিছুদিন সময় পেলে নমিতা শুধু যশস্বিনীই হত না, উপার্জনক্ষম হয়ে সংসারের দুরবস্থা ঘোচাতে পারত আর সেই সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎও নিজে গড়ে তুলতে পারত। দিব্যেন্দুর মত এক অপদার্থ যুবক তাহলে তাকে এমনভাবে ধারে কিনে নিয়ে যেতে পারত না।

কিন্তু ললিতবাবুর কিছু করবার ছিলনা। সুপুরুষ ও বিশাল ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী পাত্র যখন দ্বারে এসে পাণিপ্রার্থী, তখন পাত্রীর অভিভাবককে কেমন করে তিনি বোঝাবেন যে সব বোঝা ফেলে দেবার নয়, তার মধ্যে ঘরে তুলে রাখার মত সম্পদও থাকতে পারে! কী বলবেন তিনি, যদি অভিভাবক বলেন, থামুন মশাই—যা আজ সম্পদ নয়, কালও তা সম্পদ না হতে পারে—তখন না পারব রাখতে, না পারব

ফেলতে—তার চেয়ে এখনই সে বোঝা ফেলে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলে আমি মনে করি ?

ললিতবাবু চুপ করে আছেন দেখে দিব্যেন্দু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বললে, 'সবই তো স্থির হয়ে গেছে। এখন আমার আর নমিতার বরাত। তবে আপনার আশীর্বাদ পেলে আমাদের আর কিছু ভাববার নেই।'

এতক্ষণে ললিতবাবুর মাথায় ঢুকল দিব্যেন্দু কী বলতে চায়। হেসে বললেন, 'ভয় নেই, তোমার বাবাকে আমি কিছু বলব না।'

তের

দিব্যেন্দুর সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে শুনে নমিতা কেঁদে ফেলল। এমন জানলে সে দিব্যেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে আসত না মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে। মা আর মামার ওপর অভিমানে তার মন জর্জরিত হয়ে উঠল। তাঁরা কন্যাদায়গ্রস্ত সুতরাং বিয়ের কথা পাকাপাকি করার দায়িত্ব তাঁদের, কিন্তু নমিতার কি কিছুই বলবার ছিলনা ?

অনেক দুঃখের সঙ্গী করে সে সঙ্গীতকে বরণ করেছিল। ভাবলে পণের বিনিময়ে পণ্য করে এক সওদাগর-পুত্রকে সে সঙ্গীত বেচবার জন্যে নয়। কী দাম দেবে দিব্যেন্দু সে সঙ্গীতের ? সে হয়ত শুনবে, হয়ত বা শুনবে না। সে আর গুণমুগ্ধ শ্রোতা হয়ে

তাকে পূজো করবে না—স্বামী হয়ে দাবি করবে তারই পূজো। যে ঐশ্বর্য দিয়ে দিব্যেন্দু তাকে ভোলাতে চেষ্টা করবে সে ঐশ্বর্যের ওপর নমিতার কোন লোভ নেই। নমিতা জানে যে সে ঐশ্বর্য চাই বললেই আগলে রাখতে পারবে না—দিতে পারবে না যাকে খুশি। তাই সে খুঁজে বার করেছিল এমন ঐশ্বর্য যা তার নিজের সম্পদ্, চিরদিন যা তার কাছে অক্ষয়-ভাণ্ডার হয়ে থাকবে। —কী করে সে ভাণ্ডারকে এখন কাজে লাগাবে তাই ভেবে নমিতা অস্থির হয়ে উঠল।

এর ওপর যখন শুনল যে বিয়ের পর তাকে বিষ্ণুপুরে লুকিয়ে থাকতে হবে নমিতা আরও দমে গেল। কী লাভ তার রামের মত স্বামী পেয়ে যদি বনবাসেই জীবন কাটাতে হয়! স্বয়ং সীতাও বোধ হয় বরণ করতেন না শ্রীরামচন্দ্রকে যদি জানতেন যে তাঁর জীবনের অধিকাংশ কেটে যাবে লঙ্কায় আর বাল্মীকির তপোবনে। সীতার তবু ভাগ্য ভাল যে ডাক দিতেই মা ধরিত্রী ফাটা বুকে টেনে নিয়েছিলেন। আর নমিতা? কে শুনবে তার কান্না যদি তার বুক ফেটেও যায়?

বাবার অমতে দিব্যেন্দু বিয়ে করছে এও যেন নমিতারই শাস্তি। তাকে না দেখে, না জেনে, দূর থেকে তিনি বিচার করবেন নমিতা তাঁর সংসারে স্থান পাবে কি না। আর যতদিন না বিচারের সময় আসবে নমিতা অস্পৃশ্যার মত দূরেই সরে থাকবে—বলতে পারবেনা দিব্যেন্দু তার স্বামী—শ্রীপরিতোষ চৌধুরী তার শ্বশুর।

এ রকম নোয়া-সিঁদুরের জন্যে নমিতা প্রস্তুত ছিল না। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভেবে সে ক্রমশঃ হতাশ হয়ে যেতে লাগল।

চোদ্দ

নমিতার দুর্ভাবনার জন্যে বিয়ে আটকাল না। এক শুভদিনে দিব্যেন্দুর সঙ্গে তার মালা বদল হয়ে গেল বিষ্ণুপুরে। কলকাতায় কেউ জানল না এক ললিতবাবু ছাড়া। আসল ব্যাপার বিষ্ণুপুরের লোকও টের পেল না। ঘটনাটাকে এই ভাবে সাজান হল যেন ভূপতিবাবু নমিতা আর তার মার ভার বহন করতে না পেরে তাদের বিষ্ণুপুরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—তারপর এক সামান্য চাকুরের সঙ্গে বিষ্ণুপুরেই নমিতার বিয়ে নম-নম করে দিয়ে দেন এবং নমিতার স্বামী কলকাতা সহরে আপাততঃ বাড়ি না পাওয়ায় নমিতা বিষ্ণুপুরেই থাকতে বাধ্য হয়েছে।

এই কটা মিথ্যের কাঁচা দেয়ালের মাঝখানে নমিতার বিবাহিত জীবন শুরু হল।

দিব্যেন্দু কিন্তু অবাক করলে সবাইকে। বিয়ের পর দেখা গেল তার মত সরল, বিনয়ী, মিশুকে ছেলে হয় না। ভূপতিবাবুর চাকুরে জামাই সেজে সে প্রতি শনিবার বিকেলে হাতকাটা ছিটের শার্ট আর মালকোচা মারা খাপি মিলের ধুতি পরে বিষ্ণুপুরে নামত একটা চটের র‍্যাশান-ব্যাগ হাতে করে, আর ফিরে যেত সোমবার ভোরে। র‍্যাশান-ব্যাগের ভেতর থেকে দিব্যেন্দু বড়দিনের বুড়োর মত অসংখ্য টুকিটাকি জিনিস বার করত, আর হাঁ হয়ে চেয়ে থাকত সকলে। কোনও কোনও দিন পাড়াপ্রতিবেশীদেরও ভিড় লেগে যেত বাড়ির দালানে।

নমিতার বিয়ে হয়ে আর কিছু হোক না হোক মঙ্গলা-মামীর অবস্থা ফিরে গেল। তাঁর বড় ছেলে মানুষ হয়নি। তবে কি বর্ষা, কি শীত, পুকুর, ডোবা, খাল, বিল থেকে রোজকার মাছ সে ঠিক ধরে আনত। বাড়ির পেছনে যে সবজিবাগান ছিল তা থেকে তরিতরকারির অভাবও মিটে যেত। সমস্যা ছিল শুধু অন্নবস্ত্রের। ভূপতিবাবু যা টাকা পাঠাতেন তাতে দু বেলা পেট ভরে খাবার মত চালই কেনা যেত না। অন্যান্য জিনিস কেনা ছিল বিলাসিতা।

নমিতার বিয়ের পর দুই সংসার একান্নবর্তী হয়ে যেতে মঙ্গলা-মামীর অন্ততঃ ভাতকাপড়ের দুঃখ রইল না। তার ওপর দিব্যেন্দু যখন এটা-ওটা এনে মঙ্গলা-মামী আর তাঁর ছেলেমেয়েদের দিতে-থুতে লাগল, মঙ্গলা-মামী গদগদ হয়ে পাড়ার পাঁচজনের কাছে দিব্যেন্দুর সুখ্যাতি গেয়ে বেড়াতে লাগলেন।

একটা জিনিস কিন্তু মঙ্গলা-মামী সহ্য করতে পারতেন না। বামুনের ছেলে হয়ে দিব্যেন্দু পৈতে পরত না, গায়ত্রী করত না এই নিয়ে তিনি প্রায়ই কথা শোনাতেন নমিতাকে আর তার মাকে। নমিতার মা অনেকবার সাবধান করে দিয়েছিলেন দিব্যেন্দুকে তাই নিয়ে, যাতে অযথা লোকের সন্দেহ না জাগে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। সন্দেশ খাইয়ে সন্দেহ প্রকাশ বন্ধ করা ছিল দিব্যেন্দুর বংশগত ধারা।

দিব্যেন্দুর নতুন সংসার এমনিতে সুখের হলেও সে দেখতে পাচ্ছিল যে নমিতা তার অজ্ঞাতবাসকে সুখের জীবন বলে মেনে নেয়নি। নমিতাকে বোঝাতে সে চেষ্টার ত্রুটি করেনি যে বিচ্ছেদপূর্ণ দাম্পত্যজীবনকে অনেক আদর্শ সহধর্মিণী পরম সৌভাগ্য বলে মেনে নিয়েছে—শুধু তাদের বিশ্বাস, ভালবাসা ও পাতিব্রত্যের জোরে, এবং তাদের মধ্যে অনেকে এমন অনেককিছুই হাসিমুখে ত্যাগ

করেছে যার কাছে নমিতার সঙ্গীত-যশ কিছুই নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাছাই-করা অনেক উপন্যাস দিব্যেন্দু ধরে দিয়েছিল নমিতার সামনে। কিন্তু নমিতা মেনে নেয়নি দৃষ্টান্তগুলো।

একদিন সে বলেছিল, 'যশ আমার চাই না। সময় কাটাবার জন্যেও আমায় কি গান গাইতে দিতে পার না?'

দিব্যেন্দু আদর করে বলেছিল, 'এখানে কার কাছে তুমি অমন সুন্দর গান শোনাবে? তা ছাড়া একা একা গান গাইলে তোমার আরও খারাপ লাগবে। কলকাতার কথা মনে পড়বে—ললিতবাবুর কথা মনে পড়বে।'

নমিতা ভ্রূকুটি করে স্বামীর দিকে তাকিয়েছিল। তার ভাবতেও ভয় হয়েছিল যে দিব্যেন্দু গানের মোঁহে তাকে বিয়ে করলেও, এখন কোন চিন্তা করে না তার সাধের বৃক্ষে ফুল ফুটল না শুকিয়ে গেল। তাছাড়া এও বুঝতে পারেনি যে ললিতবাবুর মত আদর্শ গুরুকে দিব্যেন্দু সন্দেহের চোখে দেখে কি না!

দিব্যেন্দু কিন্তু আমল দেয়নি নমিতার বিরস চাউনিকে। ধরে নিয়েছিল নমিতার সয়ে যাবে এই নতুন জীবন, আর পাঁচজনের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে করতে।

এমনি করেই দিন কাটছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন দিব্যেন্দুর পায়ে অশান্তির কাঁটা ফুটল। বিষ্ণুপুরে পৌঁছতে না পৌঁছতে তার কানে এল যে আজকাল নমিতা নাকি প্রায়ই মাছ ধরতে যায় মঙ্গলা-মামীর বড় ছেলে ভুলোর সঙ্গে। ভুলো আর নমিতা প্রায় একবয়সী, ভুলো হয়ত কিছু ছোটই হবে। কিন্তু ঐ বয়সের নিষ্কর্মা ছেলের যা সাজে, নমিতা কী করে ভাবতে পারল যে তাকেও মানিয়ে যাবে সে কাজ? সব কথা ছেড়ে দিলেও, যে কোন দূরাত্মীয়ের সঙ্গে এক সমবয়সী বিবাহিতা মেয়ের মাছ ধরতে

যাওয়ার মধ্যে যে অশালীনতা থাকতে পারে সে বোধও কি নমিতার নেই ?

রাগ করে দিব্যেন্দু সারাদিন কথা বলল না নমিতার সঙ্গে।

সংবাদটা দিব্যেন্দুর কানে তুলেছিল ভুলোর বোন সরসী। নমিতার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট সে, কিন্তু পাকাবুদ্ধিতে খাটো নয়। শাড়ি পরার বয়সেও সে ছাড়িয়ে যাবে নমিতাকে। এ হেন সরসীর পুরস্কার ও নমিতার শাস্তি দিব্যেন্দু সেই দিনই হাতে হাতে চুকিয়ে দিল। বিকেলে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেল সরসী আর তার ছোট দুই ভাই-বোনকে।

সরসীর জীবনে এ এক অভিনব ঘটনা। দিব্যেন্দুর মত একজন সুদর্শন পুরুষের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে যাওয়া, তার পাশে বসে সিনেমা দেখা, এতদিন তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কোন পুণ্যের জোরে সে যে আজ হঠাৎ এত বড় সৌভাগ্য অর্জন করল তা সে বুঝে উঠতে পারছিল না। আনন্দের উচ্ছ্বাস চেপে রাখা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই নমি-দিকে সামনে পেয়ে সে হড়বড় করে বলতে লাগল তার আজকের অভিজ্ঞতার অলৌকিক কাহিনী। সাইকেল-রিকশা করে যাওয়া এবং আসা, সিনেমা ওরফে বায়স্কোপ দেখা, সিনেমার ভেতর গদি-আঁটা চেয়ারে বসে বাদাম-ভাজা খাওয়া, সরসীর ছোট ভাই বাঁটুলের দোলানিতে চেয়ার উল্টে যাওয়া, সব সে বলে ফেলল এক নিঃশ্বাসে। কথার ফাঁকে ফাঁকে সরসী চেষ্টা করেও বোঝাতে পারছিল না যে জামাইবাবুর মত মহৎপ্রাণ সে জীবনে দেখেনি।—এর ওপর জামাইবাবু সরসীকে চুপি চুপি বলেছেন যে পূজোর সময় তাকে একটা রঙিন শাড়ি আর সিল্কের ব্লাউজ উপহার দেবেন !

নমিতা চুপ করে শুনে যাচ্ছিল সরসীর কথা, আর ভাবছিল দিব্যেন্দুর হঠাৎ সরসীর ওপর এত সদয় হবার কারণ। কথায়

কথায় সরসীই উদ্‌ঘাটন করে দিল রহস্যটা। বললে, 'ভুলোদাকে জামাইবাবু কোনও দিন সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবেন না।'

—'কেন?'

—'জামাইবাবু বলেছেন তুমি তো ভুলোদার সঙ্গে মাছ ধরতে যাও। ইচ্ছে করলে ভুলোদা তোমার সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে সিনেমাও দেখে আসতে পারে। জামাইবাবুর সঙ্গে ওর যাবার দরকার কী?'

সরসীর কথা শুনে নমিতার মুখ পাথর হয়ে গেল।

দিব্যেন্দু জামাকাপড় ছেড়ে তার ঘরে একটা ডেক-চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়েছিল। হ্যারিকেনের আলো দেয়ালময় বেশ একটা স্নিগ্ধ আভা ছড়িয়ে দিয়েছিল। একটু পরেই মঙ্গলা-মামী এক গেলাস নেবুর শরবত এনে বললেন, 'আজ ভুলো মাছ পায়নি, আবার বিকেলে বাজার থেকে মাছ আনতে হল, তাই রান্নার একটু দেরি হয়ে গেল, বাবা। তুমি ততক্ষণ শরবতটা খেয়ে একটু জিরিয়ে নাও।'

একটু পরেই সরসী এল পানের ডিবে নিয়ে। বললে, 'ওপরের লবঙ্গ দেওয়া পান দুটো আমি সেজেছি।' সরসীর ছোট বোন খেঁদী একটা তালপাতার পাখা এনে নিজেই দুহাত দিয়ে জামাইবাবুকে হাওয়া করতে লাগল। তার ছোট ভাই বাঁটুল ঘরে ঢুকে খেঁদীর সঙ্গে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল পাখা নিয়ে। কে আগে পাখা এনেছে তার ওপর হাওয়া করার অধিকার জন্মায় সে তা স্বীকার করে না।

পরিচর্যার পরাকাষ্ঠায় অতিষ্ঠ হয়ে দিব্যেন্দু সরসীকে বলল, 'তোমার নমি-দিকে একবার ডেকে দাও তো।' নমি-দির নাম শুনে সকলে দমে গেল। কারণ নমি-দি থাকলে আর কেউ

সে সময় জামাইবাবুর ঘরে থাকবে না এই ছিল তাদের পিসিমার কড়া হুকুম। সরসী চলে যেতে বাকী তুজনও সুড়সুড় করে ঘর থেকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে নমিতা এসে ঘরের এক পাশে দাঁড়াল। দিব্যেন্দুর নজর এড়াল না যে ঘোমটার পরিমাণ নমিতা ইচ্ছে করেই একটু বেশী রেখেছে আজ। নমিতা অভিমান করে ঘোমটা বাড়িয়েছে এ দেখে দিব্যেন্দু খুশি হল—বেশ খানিকটা নরম হয়ে গেল। সেধে বলল তু-একটা কথা।

নমিতা কিন্তু অবগুণ্ঠনের গণ্ডির বাইরে পা বাড়াল না। তবে তার মনে হল দিব্যেন্দু বোধ হয় অনুতপ্ত—হয়ত বুঝতে পেরেছে যে তার আজ সরসীকে নিয়ে সিনেমা যাওয়ার সঙ্গে নমিতার মাছ ধরতে যাওয়ার বিশেষ পার্থক্য নেই। তাই আশা করছিল দিব্যেন্দু কথাটা এখনই পাড়বে তুজনের মন হালকা করার জন্যে। কিন্তু দিব্যেন্দু সে দিকই মাড়াল না। বললে, 'জান, আজ একটা ভারি মজা হয়েছে। সাইকেল-রিকশা করে যেতে যেতে হঠাৎ দেখি রাস্তার ধারে বিরূপবাবু দাঁড়িয়ে। আমি যে অভিনয় করছি তা ভুলে গিয়ে প্রায় নাম ধরে ডেকে ফেলেছিলুম আর কি! বরাত ভাল যে নিজেকে সামলে নিতে পেরেছি। বিরূপবাবু আমার দিকে তাকিয়েছিলেন কিন্তু আমার জামাকাপড় আর সাঙ্গপাঙ্গ দেখে তিনি নিশ্চয় বিশ্বাস করতে পারেন নি যে আমি দিব্যেন্দু চৌধুরী।' বলে সে হাসতে হাসতে নমিতার দিকে তাকাল।

নমিতা হাসতে পারল না। বরঞ্চ তার মুখ আরও গম্ভীর হয়ে গেল।

সোমবার ভোরে দিব্যেন্দু চলে যাবার পর থেকে নমিতা যেন কী এক উৎকণ্ঠায় ছটফট করতে লাগল। সে বারেবারে রাস্তার

দিকের জানলায় গিয়ে বসতে লাগল। নমিতার মা লক্ষ করে বললেন, 'হ্যাঁরে, কী হয়েছে তোর? অমন করছিস কেন?'

নমিতার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সে যে কী করছে নিজেই জানেনা। বিরুদা বিষ্ণুপুরে আছেন শুনে সে অস্থির হয়ে উঠেছে। তার অনেক কিছু বলবার আছে—অনেক প্রশ্ন করার আছে এমন কাউকে যে তাকে ঠকাবে না, ঠিক ঠিক জবাব দেবে, তার মনের জটপাকান সুতোকে আস্তে আস্তে খুলে দেবে—ছিঁড়বে না। মাকে সে-সব কিছুই বলতে পারল না নমিতা। হঠাৎ মার গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল। মা নমিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'দিব্যেন্দুর সঙ্গে সেদিনকার ঝগড়া এখনও মেটেনি বুঝি রে!' নমিতা কোন উত্তর দিল না। জলভরা চোখদুটো তুলে বলল, 'চল মা, আমরা কলকাতায় ফিরে যাই!'

—'এখন নয় মা। দিব্যেন্দুর তাহলে মান থাকবে না।'

নমিতা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল। সে বলতে চেয়েছিল যে দিব্যেন্দু তাকে উপপত্নী করে রেখেছে, পত্নীর সম্মান দেয়নি! যদি এর চেয়ে বেশী কিছু করবার ক্ষমতা তার না থাকে, তাহলে নমিতা তার আশ্রিতা হয়ে না থেকে মাকে নিয়ে ক্ষুদ্র সম্মানের সঙ্গে এই বৃহৎ পৃথিবীর এক কোণে বাস করতে রাজী আছে, মেনে নিতে রাজী আছে যে তার স্বামী তাকে গ্রহণ করেনি।

বিরুদার সঙ্গে দেখা হলে নমিতা তাঁকে শুধু এই কথাই জিজ্ঞেস করত—'বলে দিন, আমার কর্তব্যপালন সার্থক কিসে?'

পনের

বিরূপ মেদিনীপুর যাবার পর বিভূতি হেমাঙ্গিনীকে আশ্বাস দিয়েছিল, 'দেখো, এক মাসের বেশী বিরূ কলকাতার বাইরে থাকতে পারবে না। চাকরি ছেড়ে চলে আসবে।' কিন্তু তিন মাস হয়ে গেল অথচ বিরূপ ফিরল না দেখে হেমাঙ্গিনী চিন্তিত হয়ে উঠলেন। চিঠি লিখলেন যে বিরূপের কাছে গিয়ে তিনি কিছুদিন থাকতে চান।

বিরূপ বাড়িতে জানায়নি যে মেদিনীপুরে সে কোন বাড়ি ভাড়া করেনি—স্কুলের লাগোয়া কলেজের হোস্টেলে মাথা গোঁজবার একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। মাকে সেই কথা লিখে দিল। আরও লিখল যে কলেজের প্রিন্সিপাল রেবতীবাবু বিরূপের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এত খুশি হয়েছেন যে নিজেই চেষ্টা করে তাকে কলেজে বদলি করে নিয়ে এসেছেন, প্রফেসার করে।

যাই হোক কিছুদিন পরে বিরূপ দেখল যে তার ভাগ্যপরিবর্তন শুধু কলেজের এলাকায় নিবদ্ধ নয়। মেদিনীপুর সহরেও তার প্রসিদ্ধি ছড়াতে শুরু করেছে। কিসের প্রসিদ্ধি বিরূপ ঠিক বুঝতে পারল না। তবে ডাক আসতে লাগল নানান জায়গা থেকে—আসুন আমাদের কমিটিতে, রবীন্দ্র জয়ন্তীতে একটা বক্তৃতা দিন, আমাদের কাগজে আপনার দু-একটি লেখা দিয়ে বাধিত করুন।

সরল মনে বিরূপ সকলকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে বুঝল সিঁড়ির দুটো গতি আছে, এবং সে ওপরে উঠবে না নীচে নামবে তাই নিয়ে রীতিমত দলাদলি

শুরু হয়ে গেছে। একদল ঠিক করেছেন যে বিরূপকে মেদিনীপুরের সমাজে পাকাপোক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেনই। অন্যদল তা হতে দেবেন না। দলাদলি চরমে পৌছল যখন প্রথম দল বিরূপকে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের সভ্য করার সদুদ্দেশ্য নিয়ে দ্বিতীয় দলের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে ফেললেন। বলাবাহুল্য বিরোধীপক্ষ ছেড়ে কথা কইলেন না। প্রশ্ন তুললেন যে বিরূপবাবু যদি সত্যিই যোগ্য পাত্র হন তাহলে তিনি কলকাতা ছেড়ে মেদিনীপুরের মত সহরে স্কুলশিক্ষকের চাকরি করতে আসবেন কেন? সুতরাং হয় আপনারা বলুন যে তিনি বৃহত্তর কাজের অনুপযুক্ত, নয় স্বীকার করুন যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এমন কিছু ঘটে থাকবে যার জন্যে তিনি মেদিনীপুরে এসে অজ্ঞাতবাস করাটাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছেন।

কথাটা কানে যেতেই বিরূপ সঙ্গে সঙ্গে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় ফিরে যাবার জন্যে তৈরী হল। রেবতীবাবু অনেক করে বিরূপকে বুঝিয়েও যখন দেখলেন যে তাকে মেদিনীপুরে ধরে রাখা যাবে না, তিনি শেষে শুধু একটি অনুরোধ করলেন। বললেন, বিরূপ অধ্যাপনার ব্রত অন্ততঃ যেন না ত্যাগ করে। বিরূপ কী ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর কথা দিয়ে ফেলল যে নেহাত নিরুপায় না হলে সে কোনদিন ব্রত ভঙ্গ করবে না। রেবতীবাবু আনন্দে অধীর হয়ে বারবার আশীর্বাদ করলেন তাকে, আর জানালেন যে বিষ্ণুপুরের এক কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব আছে। বিরূপ গিয়ে দেখতে পারে জায়গাটা তার পছন্দ হয় কি না।

বিরূপ রাজী হল। রেবতীবাবুর চিঠি নিয়ে সে সোজা বিষ্ণুপুরে গিয়ে পৌছল।

যখন ট্রেন থামল, বাইরে প্রবল বর্ষা। মালপত্র নিয়ে বিরূপ প্ল্যাটফর্মের ছাউনির তলায় আটকা পড়ল। স্টেশন থেকে

সহরের যতটুকু সে দেখতে পেল তাতে বৃষ্টিতে ভেজার সাধ তার সঙ্গে সঙ্গে মিটে গেল। রাস্তায় মাটি, কয়লা আর সুরকি মেশান কাদা। সামনে সারবন্দী টিনের চালার মধ্যে এবড়ো খেবড়ো দোকান। স্টেশনের গা ঘেঁষে গাড়ির আড্ডা। ঘোড়ার গাড়ির সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে সাইকেল-রিকশা—তার মধ্যে মোটর গাড়িও আছে কয়েকটা। এর মধ্যে কোথায় পাবে সে গড়ের মাঠে বৃষ্টিতে ভেজার আনন্দ ?

বৃষ্টি একটু কমতে একটা সাইকেল-রিকশা ভাড়া করে বিরূপ তার গন্তব্য পথে রওনা হল। সবুজ গাছপালা, পুকুর-ডোবা, শ্যাওলা-শালুক দেখতে দেখতে, কাঁচাপাকা রাস্তার ওপর ঝাঁকুনি খেতে খেতে, কলেজ পৌঁছতে তার ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। সহরের এক প্রান্তে, নির্জন পল্লীর মাঝখানে কলেজ। বিরাট এক মাঠের সামনে কলেজের বাড়ি—মাঠের ধারে ধারে অনেকগুলো ছোট বাংলো। বেশীদিনের কলেজ নয় তা বোঝা যায়।

কলেজের অধ্যক্ষ মহেশ্বরবাবু সেই কথাই বললেন। মাত্র কয়েক বছর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ কলেজ। তাই উচ্চবেতনে অধ্যাপক রাখা আপাততঃ প্রশ্নের বাইরে। তবে বিরূপের যদি পছন্দ হয় এ কলেজ, তার অবিবাহিত জীবন স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করতে পারবে সে। কারণ চাকরি অল্পবেতনের হলেও দু একটা প্রাইভেট টিউশানি জুটে যাওয়া এমন কিছু বড় কথা নয়।

সব শুনেও বিরূপ অল্পবেতনের চাকরি প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। কলেজের ছিমছাম পরিবেশ এবং মহেশ্বরবাবুর শান্ত, সৌম্য চেহারা তাকে আকৃষ্ট করেছিল। কলেজের সুব্যবস্থার ওপর তার আস্থা আরও বেড়ে গেল যখন তাকে বলা হল যে কলেজের কলোনিতে অধ্যক্ষ ও অন্যান্য অধ্যাপকের মত তারও একটা নিজস্ব বাংলো থাকবে, আর সে হাতের নাগালে পাবে কলেজের লাইব্রেরি এই মফস্বল সহরে যার জোড়া নেই।

বাংলোটি তার খুবই ভাল লেগেছিল। পাকা গাঁথুনি আর আঁটসাট ধারছাঁটা খড়ের চাল। সামনে তৈরী বাগান, জাফরিকাটা চেঁচারির বেড়া দিয়ে ঘেরা। দেখেশুনে খুব উৎসাহের সঙ্গে বিরূপ প্রস্তুত হল সংসার পাতার হাতেখড়ি দেবার জন্যে।

মেদিনীপুরে সে কিছু টাকা জমাতে পেরেছিল। তাই থেকে প্রথমেই কিনে ফেলল একটা সাইকেল। না কিনে উপায়ও ছিল না, জায়গাটা এমন। উদ্বৃত্ত টাকা থেকে সংসার পাতার প্রথম ধাক্কাও সে সামলে নিল।

কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে আলাপ হতে বিরূপ কিন্তু দমে গেল। ভাবল তার উড়ে এসে জুড়ে বসা অনেকেই পছন্দ করেননি। বিরূপ দোষ দিতে পারল না তাঁদের। কারণ উপার্জনের সংকীর্ণ পথে ঠেলাঠেলি তাঁরা চাইবেন না এইটেই স্বাভাবিক। তবে একটি মাত্র অধ্যাপক প্রতুলবাবুকে দেখা গেল যাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই কারুর সঙ্গে। কারণ বিরূপ শুনল পৈতৃক সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করাই নাকি তাঁর পেশা, অধ্যাপনা তাঁর শখ।

কলোনিতে প্রতুলবাবুর বাংলোটি সবচেয়ে সাজানো-গোজানো। অনেকে এও বলতেন যে সারা বিষ্ণুপুরে তাঁর বাড়িটিই নাকি যথার্থ শান্তিনীড়। শুনে প্রতুলবাবুর খুব ভাল লাগত। গর্বকে ঠাট্টার রং দিয়ে বলতেন, যে নিকেতনের গৃহলক্ষ্মী শান্তিনিকেতনে মানুষ, সে নিকেতন যে শান্তিপূর্ণ হবে এ আর বেশী কথা কী?

প্রতুলবাবুর স্ত্রী দময়ন্তীর কথা বিরূপ আগেই শুনেছিল। যা শুনেছিল তাতে চমৎকৃত হতে হয়। তাঁর মত আদর্শ মহিলা নাকি বিষ্ণুপুরে এর আগে পদার্পণ করেননি। তাঁর বিশেষত্ব ছিল এই যে নিজে সর্বগুণসমন্বিতা হয়ে নির্গুণকে তিনি কখনও অনাদর করতেন না। এবং অভাব থেকে তিনি নিজে মুক্ত ছিলেন বলে অভাবগ্রস্তকে কখনও অবজ্ঞা করতেন না। ফলে, প্রতুলবাবুর বাংলো হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক নামহীন প্রতিষ্ঠান। সে প্রতিষ্ঠানের

সভ্যদের মধ্যে কলেজের শিক্ষাদাতারা তো ছিলেনই তাছাড়া বিষ্ণুপুরের হর্তাকর্তাবিধাতাদের মধ্যে ছিলেন না এমন কাউকে মনে করা যেত না। তাই দময়ন্তীদেবীকে বাদ দিয়ে যেমন কোন পাশ্চাত্য রুচির পার্টি জমত না তেমনি দময়ন্তীদেবী না হলে সংস্কারপন্থীদেরও কোন কাজ হত না—কি পূজো, কি অন্নপ্রাশন, কি গায়ে হলুদ।

প্রতুলবাবু সম্বন্ধে বিরূপের কিন্তু ধোঁকা লাগল প্রথমদিনই। একটা প্রশ্নেই তিনি হকচকিয়ে দিলেন বিরূপকে, 'মহাশয়ের জীবিকা কী?'

বিরূপের মনে হল প্রশ্নটা অসঙ্গত। তবু ভদ্রতার খাতিরে সে জবাব দিল, 'আপাততঃ প্রফেসারি।'

প্রতুলবাবু হেসে বললেন, 'মাপ করবেন। আমার মতে, অন্য কোন জীবিকার সংস্থান না করে এ কলেজের প্রফেসারি করতে আসা আর বিনা হাতিয়ারে আফ্রিকার জঙ্গলে যাওয়া এক কথা। পৈতৃক সম্পত্তি থাকে ভাল, নয়ত গোটা দু-এক ভাল টিউশানি, আর তাও না পোষায় তো নিদেন কোন উপার্জনক্ষম বা উইলপ্রাপ্তা কুমারীর সুনজর। এ সবের তোয়াক্কা না করে যিনি এ কলেজের প্রফেসারি করবার ভরসা রাখেন তাঁকে আমি নিজের খরচায় রাঁচি পাঠাতে রাজি আছি।'

বিরূপ এবার বেশ খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলল, 'প্রফেসারি ছাড়া আমার অন্য কোন জীবিকার দরকার হলে আপনাকে জানাব।'

প্রতুলবাবু কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বললেন, 'আমায় জানিয়ে কোন লাভ নাই। বরঞ্চ তাড়াতাড়ি আপনার নামটা রেজিষ্ট্রী করে ফেলবেন আমার স্ত্রীর আপিসে। তাতেই কাজ হবে।'

প্রতুলবাবুর এই অদ্ভুত কথাবার্তা শুনে বিরূপের মনে হল ভদ্রলোক এক বদ্ধ পাগল যাঁকে অকারণ সম্মান দেওয়া হয় এই কলোনিতে—তাঁর পয়সা অথবা স্ত্রীর দৌলতে।

কথায় কথায় বিরূপ একদিন প্রতুলবাবুর কথা তুলল মহেশ্বরবাবুর কাছে। মহেশ্বরবাবু হেসে বললেন, 'বিষ্ণুপুরে ঐ দুটি খাঁটি লোককে চিনতে পারা মুশকিল। প্রতুলবাবুকে যখন আপনি চিনতে পারেননি, তখন দময়ন্তীদেবীকে চিনতে পারা আপনার পক্ষে আরও মুশকিল হবে।'

—'কেন?'

—'কারণ তিনি কখনও লিপষ্টিক লাগিয়ে মেমসাহেব সেজে ঘুরে বেড়ান, কখনও খদ্দরের শাড়ি পরে জনসেবা করেন, আবার পূজোর সময় নির্জলা উপবাস করে লাল পেড়ে গরদের শাড়ি পরে ঠাকুরের পরিচর্যাও করে থাকেন।'

—'আপনার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে ওটা ওঁর একটা ভড়ং। কিম্বা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বিকৃতমস্তিষ্ক।'

—'ভড়ংই বলুন আর পাগলামিই বলুন বিষ্ণুপুর বলতে এখন দময়ন্তীদেবীকেই বোঝায়।'

বিরূপের কাছে সব কিছু হেঁয়ালির মত মনে হতে লাগল। নাম রেজিষ্ট্রী করার কথা জিজ্ঞেস করতে মহেশ্বরবাবু যা বললেন তা হল এই যে বিষ্ণুপুরের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন হলে দময়ন্তীদেবীর ওপরই নির্বাচনের ভার পড়ে। আর কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে নির্বাচন করবার দরকার হলে দময়ন্তীদেবী সকলের অবস্থা বিচার করে, যাকে সবচেয়ে যোগ্যপাত্র বলে মনে করেন তাঁকেই টিউশানি দেন।—আবার অবিবাহিত অধ্যাপক দেখলে জোর করে কোন উপযুক্ত পাত্রীর সঙ্গে বিয়েও দিয়ে দেন। কথা শেষ করে মহেশ্বরবাবু হাসতে লাগলেন।

মহেশ্বরবাবুর হাসির কথাগুলো বিরূপের ভাল লাগেনি তা তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। সে বললে, 'কোনও পুরুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন পরস্ত্রী কি করে তার বিয়ে দিয়ে দিতে

পারেন, আমার তো মাথায় ঢুকল না। যাই হোক আপনাদের এখানে যে রকম কড়া আইন তাতে বেশীদিন আমি টিঁকতে পারব বলে তো আমার মনে হচ্ছেনা।'

প্রতুলবাবুর সম্বন্ধে মহেশ্বরবাবু আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন। কথাটা চাপা পড়ে গেল।

ষোল

কিছুদিন পরে বিরূপ একদিন হিসেবের খাতা নিয়ে বসল। ডাইনে বাঁয়ে আঁক কষে দেখল যে কলেজের মাইনের ওপর নির্ভর করে সংসার চালান তার একার পক্ষেও কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বিষ্ণুপুর ছাড়বার কথা বিরূপ একবার ভেবেছিল কিন্তু কলেজের কলোনি বিশেষ করে তার নিরিবিলি বাংলোটা যে সহজে ছেড়ে যাবার নয় একথা স্বীকার করতে তার দ্বিধা ছিল না। আর কিছু না হোক পড়াশুনো করে সময় কাটানর পক্ষে এর চেয়ে ভাল জায়গা চট করে পাবে না সে।

বিরূপ ভাবনায় পড়ল। খরচ কমানর জন্যে যে কষ্টসহিষ্ণুতার দরকার হয় বিরূপের তা ছিল না। নিজের হাতে রান্না করে এবং অন্যান্য কাজে পরমুখাপেক্ষী না হয়ে পয়সার সাশ্রয় করা তার কুষ্ঠিতে লেখেনি। উপায়ান্তর খুঁজতে গিয়ে প্রতুলবাবুর কথা তার মনে হল। তাঁর কথামত কাজ করলে দু একটা টিউশানি যোগাড় করতে হয়ত খুব বেশী কষ্ট পেতে হত না।

এই রকম পরিস্থিতির মাঝখানে একদিন সকালে তকমা আঁটা একজন আর্দালি এসে বিরূপের নিদ্রাভঙ্গ করল। মোটা খামে বন্ধ করা একটা চিঠি বয়ে এনেছিল সে। বিরূপ পড়ে অবাক হয়ে গেল। তার এক বাল্যবন্ধু সত্যেন সিংহ এ্যাডিশানাল ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে সম্প্রতি বিষ্ণুপুরে বদলি হয়ে এসেছে। বিরূপের সন্ধান পেয়ে সে আমন্ত্রন জানিয়েছে কাল তার ওখানে চা খেতে। চিঠিখানা পড়ে বিরূপের খুব ভাল লাগল। এই অপরিচিত জায়গায় অমন ক্ষমতাপ্রাপ্ত বন্ধুকে পেয়ে সে যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল। পরদিন বিকেলে বেশ প্রফুল্লচিত্তে সে গেল নেমন্তন্ন রক্ষা করতে।

যে সত্যেন ছাত্রজীবনে সহপাঠীদের পরিহাসের পাত্র ছিল তাকে আজ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের রূপ ধারণ করতে দেখে বিরূপের মনে অনেক পুরনো কথা, পুরনো স্মৃতি ভেসে উঠতে লাগল। সত্যেনও যেন ভুলতে পারছিলনা যে কয়েক বছর পেছিয়ে গেলে সে কাঁধে হাত দিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারত বিরূপের সঙ্গে—অনেক কিছু বলতে পারত, হাসতে পারত মনখুলে। যাই হোক নিজের পদমর্যাদা বজায় রেখেও বিরূপকে যোগ্য সমাদর দেখাতে ত্রুটি করল না সত্যেন। তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল সাজান ড্রয়িংরুমে। সেখানে আরও কয়েকটি নিমন্ত্রিত অতিথি বসেছিলেন। সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। কেউ পুলিশ সাহেব, কেউ সিভিল সার্জেন, কেউ ব্যাঙ্কের অধিনায়ক। তাঁদের স্ত্রী, তাঁদের দুহিতা। সকলেরই বেশভূষা পরিপাটি, আধুনিক।

কথায় কথায় সত্যেন বললে যে বিরূপ মেদিনীপুর থেকে চলে আসার পরই সে সেখানে বদলি হয়েছিল এবং বিরূপ বোস নামে এক ধূমকেতুর আবির্ভাবের খবর পেয়ে তার রীতিমত আফসোস হয়েছিল ধূমকেতুটীকে না দেখতে পাওয়ার জন্যে। কিন্তু বিরূপ যে অত অল্প সময়ের মধ্যে কী করে মেদিনীপুরে অত বিখ্যাত হয়ে গেল সত্যেন তা আজও বুঝে উঠতে পারেনি।

বিরূপ বিনয়ের সঙ্গে বললে, 'আমি কিছুই করিনি। কয়েকজন সদ্‌ব্যক্তির দল ছিল কিন্তু দলপতি ছিল না, তাই তাঁরা আমায় জোর করে বিখ্যাত করবার চেষ্টা করেছিলেন।'

মিসেস হালদার জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর কী হল?'

—'তারপর বিপক্ষদল প্রমাণ করে দিলেন যে আমি একজন ভুঁইফোড়। কাজেই আমায় উচ্ছেদ করবার আগেই আমি বিষ্ণুপুরে পালিয়ে এলাম, যেহেতু উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে।'

অনেকগুলো হাসি একসঙ্গে মিলিয়ে যেতে সত্যেন বললে, 'কিন্তু এখানে তোমায় যখন ধরেছি, আমি ছাড়ছি না। তোমায় একটা দলপতি করে তবে আমি বদলি হব।'

বিরূপ হেসে বললে, 'মাপ কর ভাই, শুনেছি তোমাদের এখানে একজন দলপত্নী আছেন যিনি বিষ্ণুপুরকে মাত্র একটি কড়ে আঙুলে ধরে রেখেছেন। আমায় তাঁর হাতে বধ করে লজ্জা দিও না।'

বিরূপের কথা শুনে অনেকেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। বিরূপ বুঝল দময়ন্তীদেবীর সঙ্গে এঁরা সুপরিচিত।

মিসেস দাস জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যাঁর কথা বললেন তাঁর সম্বন্ধে আর কী শুনেছেন?'

—'ভয়ে বলব না নির্ভয়ে?'

কে বললেন, 'নির্ভয়ে বলুন।' বিরূপ চেয়ে দেখল। ওঁর নাম মিসেস মিত্রই হবে। কতখানি কসমেটিকে কতখানি বয়স ঢেকেছেন বোঝা যাচ্ছে না তাঁকে দেখে। বিরূপ নির্ভয়ে বললে, 'আমি শুনেছি, দময়ন্তীদেবীর অনুমতি না নিয়ে বিষ্ণুপুরের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার কোন কাজ করেন না, যেমন মহাত্মাগান্ধীকে না জিজ্ঞেস করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কোন কাজ করতেন না। এমনকি বাড়িতে কেউ শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী রাখতে চাইলেও দময়ন্তীদেবী বলে দেন কাকে রাখা হবে। আরও শুনেছি যে অবিবাহিত অধ্যাপক দেখলে দময়ন্তীদেবী নাকি জোর করে তার বিয়েও দিয়ে দেন।'

সকলে হো হো করে হেসে উঠলেন। শুধু হাসলেন না মিসেস দাস। তিনি তাঁর লিপষ্টিক লাগান ঠোঁটদুটো অল্প অল্প নেড়ে বললেন, 'আপনি যা শুনেছেন তা মিথ্যে না হলেও, আপনি এ কথা নিশ্চয় শোনেন নি যে দময়ন্তীদেবীর স্বামীর টাকাতেই আপনাদের কলেজ তৈরী হয়েছে।'

মিসেস মিত্র বাধা দিয়ে বললেন, 'অবশ্য কলেজের আয়ের ওপর কোন দাবি রাখেন নি তিনি। তবে ইচ্ছে করেই কলেজের অধ্যাপকদের অত্যন্ত কম মাইনে ও কম কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এই জন্যে, যে তাঁর মতে একটা বড় কাজ আর একটা বড় বেতন দিয়ে কর্মী সৃষ্টি করা যায় না—কর্মী সৃষ্টি করা সম্ভব হয় দশটা ছোট কাজ আর দশটা ছোট বেতন দিয়ে।'

বিরূপ আর একবার মিসেস মিত্রের দিকে তাকাল। তার মনে পড়ল মহেশ্বরবাবুর কথা—প্রতুলবাবুকে আপনি যখন চিনতে পারেননি তখন দময়ন্তীদেবীকে আরও চিনতে পারবেন না। মিসেস মিত্রের কথা শুনে বিরূপ স্বীকার করতে বাধ্য হল যে সত্যিই প্রতুলবাবুকে সে চিনতে পারেনি। কিন্তু সে বুঝতে পারল না যে এর মধ্যে দময়ন্তীদেবীর মাহাত্ম্য কোথায়? বিরূপ যখন যাচিয়ে নিতে শুরু করেছে সে চক্ষুলজ্জা না করে আবার প্রশ্ন করল তাহলে এই কথাই কি ধরে নিতে হবে যে প্রতুলবাবুর মাহাত্ম্যেই দময়ন্তীদেবীর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ যেমন শিবের মাহাত্ম্যে পার্বতীর?'

মিসেস মিত্র তাঁর নিখুঁত দাঁতগুলো সামান্য প্রকাশ করে বললেন, 'দময়ন্তীদেবীর ওপর আপনার দেখছি ভীষণ রাগ। কেন বলুন তো? তাঁর সঙ্গে আপনার কোনদিন প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছিল নিশ্চয়।'

—'ঝগড়া? আলাপই হয়নি।'

—'আলাপ করবেন?' মিসেস মিত্র মুচকি হাসলেন।

বিরূপ ইতস্তত: করে কী বলতে যাচ্ছিল, মিসেস মিত্র তার আগেই বলে উঠলেন, 'আমার নাম দময়ন্তী।'

আকস্মিক লজ্জায় বিরূপ মুহূর্তের জন্যে রক্তবর্ণ হয়ে গেল। একটু পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে হাতজোড় করে বললে, 'আমায় ক্ষমা করবেন।'

সত্যেন উঠে গিয়ে বিরূপের পিঠ চাপড়ে বললে, 'অত লজ্জা পাচ্ছ কেন? মজলিশের আগে বেশ একটা ইনটারেষ্টিং ওভারটুয়ার হয়ে গেল। এবার চল চায়ের পাট সেরে ফেলা যাক। তারপর মিসেস মিত্রের গান শুনলে তোমার তাঁর ওপর আর যেটুকু রাগ আছে তা একেবারে গলে জল হয়ে যাবে।'

সকলে হাসতে হাসতে উঠে চায়ের টেবিলের দিকে পা বাড়ালেন।

যেতে যেতে বিরূপ সত্যেনকে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার স্ত্রীকে দেখছিনা যে! বিয়ে করনি?'

সত্যেন হো-হো করে হেসে উঠল। সকলে তার দিকে তাকাতে সত্যেন বললে, 'বোস জিজ্ঞেস করছে আমি বিয়ে করেছি কি না। মিসেস মিত্র জানেন যে সেইজন্যেই আমি ওঁর শরণাপন্ন হয়েছি। একটু আগে বোস বলেছিল না যে জোর করে বিয়ে দেওয়ার বদনামও ওঁর আছে?'

দময়ন্তীদেবী শুধু হাসলেন।

চায়ের টেবিলে চা ও আহার্য পরিবেষণ করার ভার ছিল তাঁর ওপর। কাজ সেরে তিনি ফিরে গেলেন ফাঁকা চেয়ারটাতে। সত্যেন তাঁর চা আর প্লেট এগিয়ে দিল। একথা-সেকথার পর বিরূপ দময়ন্তীদেবীকে জিজ্ঞেস করল যে তাঁর স্বামীর তৈরী কলেজ তাঁর স্বামীর কোন আদর্শ মেনে চলে কিনা।

দময়ন্তীদেবী তার উত্তরে বললেন, 'দেখুন বিরূপবাবু, আমাদের জাতটা হল তুঃখচেতন। তুঃখ না পেলে আমাদের চেতনা হয় না।

শ্বাস উঠলে তবে আমাদের ভগবানে বিশ্বাস হয়, পালাবার পথ বন্ধ হলে আমরা পালোয়ান হই, নাড়ী শুকিয়ে যাবার পর আমাদের প্রতিভা রত্ন প্রসব করে।'

—'মানলাম।'

—'তাই দুঃখের শেষ সীমায় না পৌঁছান অবধি আমরা খালি ঠোক্কর খেয়ে ঘুরে বেড়াই। এই ঠোক্কর খাওয়া যদি আমরা সহ্য না করতাম তা হলে অন্ততঃ জাত হিসেবে আমরা ঢের বেশী সুখী হতে পারতাম। যেমন বিনা স্বার্থে ভগবানকে ভালবাসতে পারতাম, লড়াই না করেও বীর হতে পারতাম, চাবুক না খেয়েও ভাবুক হতে পারতাম।'

—'কথাটা একই দাঁড়াল। কিন্তু তার সঙ্গে কলেজের আদর্শের সম্বন্ধ কী?'

—'সম্বন্ধ হল এই যে কলেজ বলছে আপনার কাজ দিয়ে নিজেকে যাচাই করুন, নিজের মূল্য বুঝুন। কলেজের চাকরির ওপর নির্ভর করে নিজের সময়, ক্ষমতা, প্রতিভা, ভবিষ্যৎ সব একসঙ্গে নষ্ট করবেন না। দুর্দিনে আপনার যে ক্ষমতা ও প্রতিভার স্ফুরণ হোত, সুদিনে তাদের পূর্ণ বিকাশ হোক। যে শক্তি আপনি বাধ্য হয়ে অথবা লজ্জার সঙ্গে ব্যয় করতে প্রস্তুত সে শক্তি ভালবেসে, স্বেচ্ছায় ব্যয় করুন।'

আলোচনাটা গুরুগম্ভীর হয়ে যাচ্ছে দেখে সত্যেন কথা ঘোরালো। বললে, 'কিন্তু জোর করে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাটা?'

দময়ন্তীদেবী হেসে বললেন, 'সেটা আপনার বেলায় প্রযোজ্য নয়।'

—'তবে কার বেলায় প্রযোজ্য? শুধু বোসের মত ভাগ্যবান প্রফেসারদের বেলায়?'

—'ঠিক তা নয়। তবে উপার্জনকারিনী পাত্রীদের তরফ থেকে ঘটকালি করতে হলে আমি ছুটব বিরূপবাবুর মত প্রফেসারের কাছে আর তাঁদের কাছে, যাঁদের দায়িত্ব বেশী, উপার্জন কম।'

বিরূপ বললে, 'এ বিষয়ে আমি আপনার কর্তব্যবুদ্ধির প্রশংসা করার অযোগ্য।'

দময়ন্তীদেবী বললেন, 'ব্যক্তিগত প্রসাদের জন্যে যাঁরা বিয়ে করেন তাঁদের কথা আলাদা। 'আপরুচি খানা'র বিধান তাঁদেরই জন্যে, যাঁদের রুচির হেরফের করবার স্বাধীনতা আছে। খাদ্য যেখানে বাধ্যতামূলক সেখানে প্রয়োজন আগে, রুচি পরে। যেমন আগে লজ্জা নিবারণ, পরে সজ্জা।'

—'তাহলে কি বলতে চান যে বিয়ের অর্থনীতিটাই সব, আর ব্যক্তিগত পছন্দ, ভালবাসা এসব কিছুই নয়?'

দময়ন্তীদেবী মাথাটা চেয়ারের পিঠে হেলিয়ে দিয়ে বললেন, 'আলোচনার গণ্ডিটা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। তবে একটা কথা ভেবে দেখুন। রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে রুগীর পছন্দ-অপছন্দের কথা ভাবলে রোগও সারে না, রুগীও খুশি হয় না।'

বিরূপ হেসে বলল, 'বিয়ের সঙ্গে রোগের উপমা শুনে একটা কাহিনী মনে পড়ে গেল। একজন 'হেড-আপিসের বড় বাবুর' বাতিকই ছিল ছুটির দরখাস্ত পেলে তার ওপর লিখে দেওয়া 'এম-সি প্লিজ' অর্থাৎ মেডিক্যাল সার্টিফিকেট চাই। আপিসের এক নব্যযুবক বিয়ের জন্যে ছুটি চেয়ে পেল একই আদেশ— 'এম-সি প্লিজ।' ছোকরাটী ডেঁপোমিতে দড়। সে সবিনয়ে এক দরখাস্ত করল বড় সাহেবের কাছে—'মহাশয়, বিয়ে যে একপ্রকার রোগ তা আমার জানা ছিল না।' বড় সাহেব মহা ফাঁপরে পড়লেন। অনেক ভেবে শেষকালে জবাব দিলেন, 'এ ক্ষেত্রে এম-সি মানে ম্যারেজ সার্টিফিকেট। সম্ভব হলে দাখিল করা যেতে পারে—নচেৎ বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রই যথেষ্ট প্রমাণ বলে মেনে নেওয়া হবে। আপাততঃ ছুটি মঞ্জুর।'

বিরূপের গল্প শেষ হতে হাসির রোল উঠল। সত্যেন এরপর আর কথার আসর জমতে দিল না। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বলল,

'এইবার আমরা সর্বসম্মতিক্রমে দময়ন্তীদেবীকে অনুরোধ করছি যে তিনি তাঁর মধুর কণ্ঠের কয়েকটি গান শুনিয়ে আমাদের ধন্য করুন।'

বিরূপ বললে, 'সত্যেন, আই মিন্ সিনা বলতে চাইছে যে দময়ন্তীদেবীর কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে এতক্ষণ অনেক কিছু গলাধঃকরণ করা গেল। এবার তাঁর কণ্ঠের সুর শুনতে শুনতে অন্তঃকরণ ভরান যাক।'

দময়ন্তীদেবী বললেন, 'মিস্টার বোস সাহিত্যিক হলে ভাল করতেন।'

চায়ের টেবিল ছেড়ে সকলে আবার ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসলেন। দময়ন্তীদেবীকে গান গাইবার জন্যে আরও দু-একবার বলতে হল। অবশেষে তিনি উঠে গিয়ে অর্গ্যানের সামনে বসলেন এবং কী গাইবেন তা নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা হবার পর গান শুরু করলেন।

গান শুনতে শুনতে বিরূপ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। তার চমক ভাঙ্গল গানের শেষে হাততালি শুনে। লজ্জিত হয়ে বিরূপ সজাগ হয়ে বসল।

সকলের অনুরোধে দময়ন্তীদেবী আর একখানি গান আরম্ভ করলেন।

বিরূপের হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল নমিতার কথা। ললিতবাবুর স্কুলে নমিতার সে গান বিরূপের কানে হঠাৎ যেন বেজে উঠেছিল। সে গান বিরূপ বোঝেনি, কিন্তু গানের সুরকে দিয়ে নিজেকে বুঝেছিল।

দময়ন্তীদেবীর গানের সময় বিরূপের আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা মিসেস হালদার লক্ষ করেছিলেন। দ্বিতীয় গান শেষ হতেই তিনি ঠেস দিয়ে বলে উঠলেন, 'দময়ন্তীর গান শুনে মিস্টার বোস জল না হয়ে পাথর হয়ে গেলেন দেখছি।'

দময়ন্তীদেবী ঘাড় ফিরিয়ে বিরূপের দিকে তাকালেন।

বিরূপ তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'যদি পাথর হয়ে গিয়ে থাকি তো কারুর শাপে।'

কেউ কেউ হেসে উঠেছিলেন, কিন্তু চুপ করে গেলেন মিসেস হালদারের দিকে চোখ পড়তে।

সতর

দু-চারদিন পরে বিরূপ বাড়ি থেকে চিঠি পেল। মা আবার লিখেছেন বিরূপের কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকবার কথা। বিরূপ আজই লিখে দিত মাকে আসবার জন্যে—কিন্তু এখানে তার হাল দেখলে আর রক্ষে নেই। সঙ্গে সঙ্গে বাক্স-বিছানা বাঁধিয়ে বিরূপকে তিনি ধরে নিয়ে যাবেন কলকাতায়।

মার চিঠির তলায় মায়াও লিখেছিল কয়েক ছত্র। তাতে সে জানিয়েছিল যে বিরূপ বিষ্ণুপুরে গেছে ভালই হয়েছে, কারণ নমিতা তার মার সঙ্গে এখন বিষ্ণুপুরে আছে, নমিতার মামাদের দেশের বাড়িতে। ঠিকানাও মায়া দিয়েছিল আর বিশেষ করে বলেছিল মাঝে মাঝে নমিতাদের খোঁজখবর নিতে।

চিঠি পেয়ে বিরূপ পরদিনই কলেজের পর সাইকেল নিয়ে বেরল নমিতাদের বাড়ির সন্ধানে। পাড়ায় পৌঁছে নমিতার মামার নাম বলতেই এক ভদ্রলোক দেখিয়ে দিলেন বাড়িটা। বড় রাস্তার ওপরেই বাড়ি, বাড়ির গেট একপাশে, গলির মধ্যে।

বিরূপ সাইকেল ধরে গলির ভেতর ঢুকল। গেট বলতে দুটো থাম, প্রতিবন্ধের বালাই নেই। উঠোনে গিয়ে বিরূপ ইতস্ততঃ করে ডাকল নমিতার নাম ধরে। নমিতা আশপাশেই কোথাও ছিল। বিরূপের গলা পেয়ে তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এল। বিরূপকে দেখে থমকে গিয়ে, ঘোমটাটা ভাল করে টেনে, একটা থামের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। বিরূপ অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তার দিকে।

কী করা উচিত নমিতা ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। দালানে একটা মাদুর পেতে দেবে না বিরূদাকে বলবে ভেতরে আসতে? না ঘরে যে ডেক-চেয়ারটা আছে সেটাকেই টেনে আনবে বাইরে?

বিরূপ দালানের গায়ে সাইকেলটা হেলান দিয়ে রেখে বললে, 'মা কোথায়?'

নমিতা যেন থই খুঁজে পেল। বললে, 'একটু দাঁড়ান, আমি মাকে ডেকে আনছি।'

একটু পরে নমিতার মা এসে নমিতাকে বললেন দালানের ওপর একটা মাদুর বিছিয়ে দিতে, তারপর নমিতাকে কী বললেন—নমিতা ভেতরে চলে গেল। বিরূপকে বললেন, 'বোসো বাবা।'

বিরূপ বসতে নমিতার মা মায়ার কথা আর বিরূপদের বাড়ির আর সকলকার কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। বিরূপের বিষ্ণুপুরে আসার কারণও জানতে চাইলেন। বিরূপ তাঁর কথার জবাব দেওয়া শেষ করে বলল, 'নমিতার কবে বিয়ে হল? কোথায় বিয়ে হল? এই বিষ্ণুপুরে?'

—'হ্যাঁ বাবা। জামাই কলকাতায় থাকে। শনিবার শনিবার আসে, আবার সোমবার চলে যায়।'

—'জামাইয়ের নাম কী? কী করেন তিনি?'

নমিতার মা প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন, 'দাঁড়াও বাবা, নমিকে বলে আসি তোমার জন্যে চা করতে।'

নমিতার মা অমন ভাবে উঠে যেতে বিরূপ অপ্রতিভ বোধ করতে লাগল।

খানিক পরেই তিনি ফিরে এলেন। নমিতাও পেছন পেছন চায়ের পেয়ালা হাতে করে এসে, পেয়ালাটা মাটিতে নামিয়ে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

বিরূপ নমিতাকে জিজ্ঞেস করল, 'গান গাইছ না ছেড়ে দিয়েছ?'

নমিতা মাথা নীচু করে বলল, 'এখানে এসে অবধি গান গাইনি।'

—'কেন? তোমার স্বামী কি গানবাজনা পছন্দ করেন না?'

নমিতার মা বলে উঠলেন, 'পছন্দ করে না আবার? গান শুনেই তো বিয়ে করতে চাইল। একটা পয়সা নেয়নি।'

—'ও।' বলে বিরূপ চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিল বুকের কাছে।

এমন সময় সরসী এসে নমিতাকে বললে, 'চুলের দড়িটা খুঁজে পাচ্ছি না, একটা দড়ি দাও তো।' তারপর বিরূপকে দেখে কোন রকম লজ্জা না করে নমিতার কানে কানে জিজ্ঞেস করল, 'ইনি কে?' নমিতা কোন উত্তর না দিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল। সরসীও বিরূপের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নমিতার পেছন পেছন ঘরে ঢুকল।

সরসীকে দেখে বিরূপ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তার চিনতে ভুল হয়নি যে এই সে কালো মেয়েটি যার সঙ্গে-সে দিব্যেন্দুকে একদিন দেখেছিল স্টেশনের রাস্তায়। সেদিন দিব্যেন্দুকে সে চিনেও চিনতে পারেনি, কিন্তু আজ তার মনে কোন সন্দেহ নেই। বিরূপ গলার স্বর নীচু করে নমিতার মাকে জিজ্ঞেস করল, 'দিব্যেন্দু কি লুকিয়ে নমিতাকে বিয়ে করেছে?'

নমিতার মা শিউরে উঠলেন। ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কী করে জানলে বাবা? কথাটা কি জানাজানি হয়ে গেছে?'

বিরূপের করুণা হল নমিতার মার মুখ দেখে। বললে, 'অন্ততঃ আমার কানে খবরটা পৌঁছয়নি। তবে দিব্যেন্দুকে আমি আগে চিনতাম। তারপর তাকে কিছুদিন আগে বিষ্ণুপুরে দেখেছি ঐ মেয়েটির সঙ্গে। তাই অনুমান করে নিলাম যে—।'

নমিতার মা বিরূপের দিকে একটু সরে বসলেন। ভয়ে ভয়ে চাপা গলায় বললেন, 'কিন্তু দেখো বাবা কথাটা যেন বাইরে না যায়। নমির তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তুমি মায়ার দাদা—তার মানে নমিরই দাদা—তোমায় আর কী বলব?'

বিরূপ গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমার সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিন্তু আশাকরি আপনি জানেন যে দিব্যেন্দুরা কায়স্থ এবং তার বাবা এ বিয়ে মেনে নিতে রাজী হবেন কিনা তা—।'

নমিতার মা বাধা দিলেন।—'ওসব কথা এখন থাক বাবা।'

বিরূপ চুপ করে থাকতে পারল না। বললে, 'তাহলে জেনেশুনেই আপনারা এ বিয়েতে রাজী হয়েছিলেন, বলুন।'

—'হ্যাঁ, বাবা। আমাদের অবস্থা তো জান। অমন সুন্দর, বড়লোকের ছেলে যখন যেচে এসে বিয়ের কথাটা পাড়ল, আমরা না বলতে পারলুম না।'

—'কতদিন হল বিয়ে হয়েছে?'

—'গত ফাগুন মাসে।'

—'বলেন কি?' বিরূপ চমকে উঠল। 'সেই থেকে দিব্যেন্দু নমিতাকে এই ভাবে রেখে দিয়েছে? কী বলছে সে?'

—'জানিনা বাবা। কিন্তু এখন নমিতার আর কিছু করবার উপায় নেই। দিব্যেন্দু যা বলে তাই তাকে শুনতে হবে। তা না হলে—।'

নমিতাকে ঘর থেকে বেরতে দেখে তিনি চুপ করে গেলেন। নমিতা তা লক্ষ করেছিল।

বিরূপও আর বসল না। উঠে পড়ে বললে, 'আজ আসি, মাসিমা।'

নমিতার মা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা। মাঝে মাঝে এসো।'

নমিতা বুঝতে পেরেছিল যে বিরূদা তার বিয়ের কথা জানতে পেরেছেন। বিরূপ চলে যেতেই তাই সে মাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। নমিতার মা সব কথা খুলে বললেন। শুনে নমিতার মুখ আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিরূদা নিজে থেকেই যখন সব জানতে পেরেছেন আর প্রশ্ন করেছেন যে দিব্যেন্দু কেন নমিতাকে এ ভাবে ফেলে রেখেছে, তখন কিছু একটা বিহিত তিনি করবেনই। অন্ততঃ দিব্যেন্দুকে তিনি বোঝাবেন, আর তারপর সে কখনই এমন নির্বিকার হয়ে মাসের পর মাস লুকোচুরি খেলে কাটাতে পারবে না।

আঠার

দুর্গাপূজো যে এসে গেছে বিষ্ণুপুরের পথেঘাটে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ। সন্দেহ হয় মেঘ না তুলো। শূন্য যে এত নীল তাই বা কে জানত? গাছপালা

মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। যেন নতুন করে যৌবন ফিরে পেয়েছে পাতা ঝরার আগে।

আগের সপ্তাহে দিব্যেন্দু পূজোর কাপড়চোপড় আনেনি। বলেছিল পরের শনিবার পঞ্চমী, সেদিন এসে চারপাঁচদিন থাকবে। কিন্তু নমিতার সঙ্গে মনকষাকষি হওয়ায়, শেষপর্যন্ত কাজের কথাগুলো চাপা পড়ে গিয়েছিল। নমিতার মার মনে তাই সন্দেহ উঁকি দিচ্ছিল, যদি দিব্যেন্দু রাগ করে এ সপ্তাহে না আসে ?

হাতে তাঁর এমন টাকা ছিলনা যে ষষ্ঠীর দিন পরবার মতন একখানা করে কাপড় অন্তত: নমিতা আর মঙ্গলাবৌদির ছেলেমেয়েদের জন্যে কিনে আনেন। দাদা অর্থাৎ ভূপতিবাবু অবশ্য মনিঅর্ডারে পাঠিয়েছিলেন দশটা টাকা, পূজোর খরচ বলে। না পাঠালেও বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু তা দিয়েই বা কোনদিক সামলান যায় ? নমিতার মা রীতিমত দুশ্চিন্তায় পড়লেন।

শুক্রবার হঠাৎ দিব্যেন্দুর টেলিগ্রাম এল যে এ সপ্তাহে সে আসতে পারবে না। নমিতার চোখ ফেটে জল এল। নমিতার মা প্রমাদ গণলেন। তিনি যা ভয় করছিলেন তাই।

নমিতার মঙ্গলা-মামী কাপড়চোপড়ের জন্যে ভাবেন না। ছেলেমেয়েদের কোরা জামাকাপড় আর নিজের গরদ কিছু না কিছু প্যাঁটরা থেকে পাওয়া যাবে। কোরা কাপড় আর গরদ কোনদিন অশুদ্ধ হয় না। আর নেহাত দরকার হলে একখানা গামছা কিনে এনে গায়ে ছুঁইয়ে নিলেই হবে।

দিব্যেন্দুর তারের কথা শুনে নমিতার মাকে তাই বললেন, 'অত উতলা হচ্ছ কেন ? দিব্যেন্দু যদি সত্যিই কিছু না পাঠায়, যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে অখন।'

—'কিন্তু ব্যবস্থা করার আর সময় কোথায় ? আজ চতুর্থী, পরশু ষষ্ঠী।'

মঙ্গলা-মামী অত তড়িঘড়ি ব্যবস্থা করতে অভ্যস্ত নন। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মেয়ের কথা জামাই ভাববে। তুমি তোমার ভাবনা ভাব। স্বামী যদি না পোঁছে তো সে নমির বরাত। তুমি আমি ভেবে কী করব?'

নমিতার মা চোখের জল লুকোতে নিজের ঘরে চলে গেলেন। যে বিয়ের সৌভাগ্যে মেয়ে রাজরাণী হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন সে বিয়ের যে এই পরিণাম হবে তা তিনি কেমন করে জানবেন? কিন্তু সবচেয়ে অস্বস্তিকর এই যে দিব্যেন্দুকে এ নিয়ে কিছু বলা চলবে না।

পরদিন পঞ্চমী। শনিবার। দিব্যেন্দু আসতে পারবে না জেনেও নমিতার মা বিকেলের ট্রেনের সময় অবধি অপেক্ষা করলেন। যখন বুঝলেন আর আশা নেই, ভুলোকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর তোরঙ্গে ভূপতিবাবুর পাঠান দশটাকার নোটটা সযত্নে তোলা ছিল। নোটখানা বার করে ভুলোর হাতে দিয়ে বললেন দেখেশুনে একটা রঙিন শাড়ি নিয়ে আসতে নমিতার জন্যে।

ভুলো টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে দালান থেকে উঠোনে লাফ দিতে নমিতা ডাকল, 'এই ভুলো, শুনে যা।'

ভুলো চোখ পিটপিট করে বললে, 'কী?'

—'কোথায় যাচ্ছিস?'

—'তোমার জন্যে কাপড় আনতে।'

—'টাকা কে দিলে?'

—'পিসিমা।'

—'কাপড় আনতে হবে না। টাকা দে।'

—'পিসিমাকে না জিজ্ঞেস করে তোমায় টাকা দিয়ে গালাগাল খাই আর কি!' বলে ভুলো চলে যাচ্ছিল।

নমিতা থাকতে না পেরে ভুলোর ডান হাতটা খপ করে চেপে ধরে বললে, 'দে—টাকা দে—নইলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।'

ভুলো তার ট্যাঁক সামলাতেই নমিতা টাকার সন্ধান পেয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা নিয়ে রীতিমত কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল। ভুলোর নখ লেগে নমিতার হাত ছড়ে যেতে, নমিতা বেশ জোরেই একটা চড় মারতে গিয়েছিল ভুলোকে, কিন্তু ভুলো নমিতার হাতখানা ধরে ফেলল। নমিতা হাতটা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল আর গালাগাল দিচ্ছিল ভুলোকে, এমন সময় ভুলো নমিতার হাত ছেড়ে দিয়ে একেবারে পাঁই পাঁই করে দৌড়ল উলটোদিকে। নিমেষের মধ্যে কোথা দিয়ে যে অদৃশ্য হয়ে গেল নমিতা বুঝতেই পারল না।

নমিতা হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সামনে দিব্যেন্দু। থতমত খেয়ে সে তার এলোমেলো কাপড়ের একটা অংশ কোনও মতে মাথায় টেনে দৌড়ে ঘরের ভেতর চলে গেল, তারপর এ-ঘর ও-ঘর দিয়ে একেবারে মার কাছে। নমিতার মা তুলসীতলায় সন্ধ্যে দেবার জন্যে পিদ্দিম জ্বালছিলেন। নমিতাকে অমন ভাবে ছুটে আসতে দেখে ভয় পেয়ে বলে উঠলেন, 'কী হয়েছে রে ?'

নমিতা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এসেছে।'

—'কে ? দিব্যেন্দু ?' বলে নমিতার মা হন্তদন্ত হয়ে উঠে গেলেন। বলে গেলেন কাপড় ছেড়ে পিদ্দিমটা তুলসীতলায় দিয়ে আসতে।

নমিতার মা দালানে গিয়ে দেখলেন দিব্যেন্দু সাইকেল-রিকশা থেকে অনেক জিনিসপত্র নামাচ্ছে। তিনি ব্যস্ত হয়ে ডাকতে লাগলেন, 'অ ভুলো, ভুলো!' তাঁর মনে পড়ল যে ভুলোকে তিনি নমিতার শাড়ি কিনতে পাঠিয়েছেন। কী করবেন কিছু ঠিক করতে না পেরে নমিতাকেই ডাকতে লাগলেন, 'নমি—অ নমি! জিনিসপত্তরগুলো ধরনা বাছা।'

দিব্যেন্দু নমিতা বা ভুলোর অপেক্ষা না করে সাইকেল-রিকশাওলাকে দিয়ে জিনিসপত্রগুলো ঘরের মধ্যে তুলিয়ে তাকে ছেড়ে

দিল। নমিতার মা দু-পা এগিয়ে গেলেন দিব্যেন্দুকে যাতে বেশী দূর এসে প্রণাম না করতে হয়। বললেন, 'শেষপর্যন্ত যে তুমি আসতে পারবে আমি তো ভাবতেই পারিনি।'

দিব্যেন্দু কিন্তু আজ শাশুড়ীকে প্রণামও করল না, তাঁর কথার কোন জবাবও দিল না। সোজা ঘরের মধ্যে চলে গেল।

নমিতার মা তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন নমিতার কাছে, দিব্যেন্দুর রাগের কারণ জানতে। নমিতার বেহায়াপনার কাহিনী শুনে যা মুখে এল তাই বলে গালাগালি দিলেন তাকে। তারপর ধমক দিয়ে বললেন তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে, সন্ধ্যে দিয়ে, দিব্যেন্দুর জন্যে চা-জলখাবার নিয়ে যেতে।

এতেও শান্ত হচ্ছিল না তাঁর মন। নিজেই উনুনে চায়ের কেটলি বসিয়ে মঙ্গলা-বৌদিকে দিব্যেন্দুর আসার খবরটা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে তিনি আবার দিব্যেন্দুর কাছেই গেলেন। দিব্যেন্দু আধো-অন্ধকারে শুয়েছিল তার ডেক-চেয়ারটাতে। নমিতার মা আসতে কোন কথা বলল না। লজ্জা তিনি পেলেন। বললেন, 'ওমা, আলো দেয়নি তোমার ঘরে?' বলে আবার ছুটলেন হ্যারিকেন আনতে।

ফিরে এসে হ্যারিকেনটা টেবিলের ওপর রেখে নমিতার মা ভনিতা না করে সোজাসুজি পাড়লেন কথাটা। বললেন, 'নমির কোন দোষ নেই বাবা। তুমি আসতে পারলে না দেখে আমি ভুলোর হাতে দশটা টাকা দিয়ে দোকানে পাঠাচ্ছিলুম নমির জন্যে একটা কাপড় কিনে আনবার জন্যে। নমি তোমার ওপর অভিমান করে ভুলোর হাত থেকে টাকাটা কাড়তে গিয়েছিল। সেই রাগে ভুলো নমির হাতটা এতখানি খিমচে দিয়েছে!' বলে তিনি দু-আঙুলের সাহায্যে খিমচনর পরিমাণটা দেখালেন।

দিব্যেন্দু এতক্ষণে মুখ খুলল। কিন্তু তার রাগের আসল কারণটা চেপে গিয়ে বললে, 'আমি ইচ্ছে করেই টেলিগ্রামটা

করেছিলাম শুধু দেখতে যে আপনারা কী করেন। দেখলাম যে আমার ওপর আপনাদের কারুরই বিশ্বাস নেই। তাছাড়া আমার বা আমার বাড়ির কারুর অসুখবিসুখের জন্যে আমি যে আটকা পড়ে যেতে পারি এ দুশ্চিন্তাও আপনাদের কারুর হয়েছিল বলে আমার মনে হচ্ছে না।'

দিব্যেন্দুর কথা শেষ হতে না হতেই মঙ্গলামামী ঘরে ঢুকলেন এবং একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে ফেললেন, 'কেমন আছ বাবা? হঠাৎ কী হয়েছিল? অসুখবিসুখ করেনি তো? বাড়ির সকলে ভাল আছেন তো?' উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি বলে চললেন, 'তোমার তার পেয়ে নমির মা ত ভেবেই অস্থির—কাল সারারাত একেবারে ঘুমোয়নি—শেষে আমি অনেক করে বোঝাই তবে একটু সামলাল নিজেকে।'

এরপরেও চেয়ার ছেড়ে না উঠলে খারাপ দেখায়। হয়ত তাই ভেবে দিব্যেন্দু উঠে গিয়ে দুজনকে প্রণাম করল।

আশীর্বাদ করে নমিতার মা হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার কিছুদিন থাকবে তো?'

—'দেখি।' বলে দিব্যেন্দুও অল্প হাসল। নমিতার মার বুক থেকে মস্তবড় বোঝা নেমে গেল।

কলকাতা থেকে সে কী পূজোর বাজার করে আনল তা দেখাবার জন্যে দিব্যেন্দু মনে মনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এবার সে পোঁটলা-পুঁটলিগুলো খুলতে আরম্ভ করল।

জামাইবাবুর আগমনবার্তা পেয়ে সরসী আর তার ছোট ভাইবোন বাঁটুল আর খেঁদী নাচতে নাচতে ঘরে ঢুকল। 'আমার জন্যে কী এনেছেন?' এক প্রশ্ন সকলের মুখে। দিব্যেন্দু হাসতে হাসতে একরাশ জামাকাপড় বার করল। কারুর কথা ভোলেনি সে। সরসীর সিল্কের ব্লাউস আর রঙীন শাড়ি ত এনেছেই। হাতে হাতে সরসী আর তার

দুই ভাইবোনের জামাকাপড় বিতরণ করে দিব্যেন্দু একটা ধুতি আর একটা পাঞ্জাবি মঙ্গলামামীর হাতে দিয়ে বলল, 'এ দুটো ভুলোর।' সব শেষে দুই শ্বাশুড়ীকে দু-খানা গরদ প্রণামী দিতে গদ গদ হয়ে উঠলেন তাঁরা দুজনেই।

জামাইবাবু একটা পোঁটলা আর একটা বাক্স খুললেন না দেখে সরসী কৌতূহল চেপে রাখতে পারলনা। জিজ্ঞেস করল, 'ও দুটোতে কী আছে জামাইবাবু? মঙ্গলামামী বললেন, 'ও সব তোমার নমি-দির জামাকাপড়।' খেঁদী বড় বড় চোখ করে বলল, 'নমি-দির অত জামাকাপড় ?' সরসী ধমক দিয়ে উঠল, 'তুই থাম।'

সরসীর চোখ কিন্তু লক্ষ্য হারায়নি। বাক্সটার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, 'ওটা বুঝি জুতোর বাক্স ?'

'ওমা সত্যিই তো! ও বাক্সটা কিসের ?' মঙ্গলামামী চেপে ধরলেন দিব্যেন্দুকে। ঐ নতুন ধরনের বাক্সর মধ্যে নতুন কোন দ্রষ্টব্য থাকবে এ অনুমান করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়নি।

দিব্যেন্দু বিনয়ের সঙ্গে বললে, 'ওটা রেডিও।'

'রেডিও ?' ম্যাজিক দেখার মত অবাক হয়ে গেলেন সবাই। নমিতার মা আনন্দ আর গর্ব একসঙ্গে প্রকাশ করে বললেন, 'নমি একলাটি থাকে বলে বুঝি ওর জন্যে রেডিও এনেছে ? তা বেশ করেছ বাবা।'

জামাইবাবু রেডিও এনেছেন এবং তা নমিদির জন্যে এ যেন বাড়ির গৌরব। সরসী আর তার ভাই-বোন চিৎকার করে সুখবরটা ঘোষণা করতে করতে ছুটল নমিদির কাছে। শব্দ পায়ের চেয়ে অনেক জোরে ছোটে বলে নমিতা খবরটা আগেই পেয়ে গেল আর সময় পেল মনের আনন্দ লুকিয়ে রাখবার। তাই সরসী আর তার ভাই-বোন যখন রান্নাঘরে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অত বড় সুসংবাদটা নমিদিকে জানাল, নমিদি একবার হাসলও না! শুধু চায়ের পেয়ালা আর জলখাবারের থালা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে

বলল, ‘রেডিওর কল্যাণে তোমাদের পাড়াবেড়ান বন্ধ হলেও বুঝব রেডিওর ভাগ্য ভাল।’

পরদিন সকালে দিব্যেন্দু নিজে এরিয়াল টাঙ্গাবার ভার নিয়ে বেশ আসর জমিয়ে বসেছিল ছাদের ওপর। বাঁশের অভাবে বেলা বেড়ে যাচ্ছিল। ভুলো মাছ ধরে বাড়ি ঢুকতেই সরসী তাকে হুকুম করল ভাল দেখে তুটো বাঁশ নিয়ে আসতে। ভুলো কোথা থেকে যোগাড় করে নিয়ে এল একজোড়া সবুজ লম্বা বাঁশ—তাজা আখের মত ডগা।

পরম উৎসাহে দিব্যেন্দু এরিয়াল বাঁধতে শুরু করল।

হঠাৎ নীচে কার গলা পেয়ে সরসী আলসের ওপর ঝুঁকে বলে উঠল, ‘বিরূদা এসেছেন।’

চমকে উঠে দিব্যেন্দু হাত থেকে ছুরি আর কালো তারটা ফেলে দিয়ে আলসের দিকে ছুটে গেল। দেখল সত্যিই বিরূদা মানে বিরূপবাবু। উঠোনে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলছেন।

দিব্যেন্দু সরসীকে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি ওঁকে চিনলে কী করে?’

—‘কেন? উনি তো বিষ্ণুপুরেই থাকেন। কলেজে কত বড় বড় ছেলেদের পড়ান। খুব বিদ্বান উনি।’

তারের কালিমাখা হাত তুটোর দিকে চেয়ে দিব্যেন্দু বলল, ‘ও।’ আর কোন কথা না বলে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল।

দালানে না গিয়ে ঘরের ভেতর দিয়ে দিব্যেন্দু তার নিজের ঘরে পৌঁছল। দেখল নমিতা দালানে যাবার দরজার একটা কপাট ধরে দাঁড়িয়ে আছে—তার দৃষ্টি বাইরের দিকে।

ঘরের মধ্যে কার নড়াচড়ার আওয়াজ পেয়ে নমিতা মুখ ফিরিয়ে দেখল দিব্যেন্দু আলনা থেকে ছিটের হাফশার্টটা টেনে নিয়ে সেটা

পরতে পরতে জুতোজোড়ার মধ্যে পা গলাচ্ছে। তার মুখের থমথমে ভাব দেখে নমিতার বুঝতে বাকী রইল না কিছু। ভয়ে তার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। তবু সাহস করে সে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

দিব্যেন্দু কটমট করে নমিতার দিকে তাকিয়ে বললে, 'যমের বাড়ি।'

নমিতা শিউরে উঠে, তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে পিঠ দিয়ে চেপে ধরল, যাতে দিব্যেন্দুর কথা অন্ততঃ বিরূদা না শুনতে পান।

দিব্যেন্দু জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে শ্লেষের সঙ্গে বললে, 'এবার বুঝেছি যে সেদিন যখন বললুম রাস্তায় বিরূপবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তুমি কেন এমন ভাব দেখিয়েছিলে যেন বিরূপবাবুকে তুমি চেনই না।'

—'বিরূপবাবু আমাদের পরিচিত তা কি তুমি জানতে না?'

—'জানতাম। কিন্তু এ কথা জানতাম না যে তোমার দেখাশুনো করবার জন্যে তিনি বিষ্ণুপুরে এসে রয়েছেন, এবং এ বাড়িতে তিনি যাতায়াত করেন যখন আমি থাকি না।'

—'কী বলছ তুমি?'

—'আমি কী বলছি তা তুমি ভাল করেই জান। যাক— আমার টেলিগ্রামটা যে এত কাজে লাগবে আমি তা আশা করিনি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তোমায় বরণ করে ঘরে তোলবার আগে তোমার স্বরূপ জানতে পারলুম।' বলেই দিব্যেন্দু অন্য দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

নমিতার মা টের পেয়েছিলেন যে দিব্যেন্দুর সঙ্গে নমিতার আবার একটা ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়েছে, কিন্তু পাছে বিরূপ কিছু ভাবে এই জন্যে তার সঙ্গে পাঁচরকম কথা বলে ঝগড়ার ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করছিলেন। নমিতার দরজা বন্ধ করে দেওয়া তিনি লক্ষ করেছিলেন, কিন্তু আবার যখন দেখলেন যে দরজাটা

হাওয়ায় আস্তে আস্তে খুলে গেল, তিনি না উঠে পারলেন না। ঘরে গিয়ে দেখলেন নমিতা বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদছে।

—'আবার কী হল? দিব্যেন্দু কোথায়?' নমিতাকে ঠেলা দিয়ে নমিতার মা চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

নমিতা এ প্রশ্নের উত্তরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বিরূপ কান্নার আওয়াজ পেয়ে বাইরে বসে থাকতে পারল না। ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

নমিতার মা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'কী জানি বাবা, নমিতা আর দিব্যেন্দুর কাণ্ড।'

বিরূপের সামনে নমিতা শুয়ে থাকতে পারল না। বিছানা ছেড়ে উঠে, চোখের জল মুছতে মুছতে মাকে বলল, 'বিরূদাকে বল মা, যদি পারেন আমাদের কলকাতায় নিয়ে যেতে।'

বিরূপ নমিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'কেন? কী হয়েছে? দিব্যেন্দু কোথায়? আমি তাকে ডেকে এনে তোমাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিচ্ছি।'

নমিতা বলতে পারল না যে প্রশ্নটা দাম্পত্যকলহ মেটানর মত হালকা নয়, প্রশ্নটা হল এই যে স্বামী তার স্ত্রীর চরিত্রকে কদর্য সন্দেহে পঙ্কিল করে দিলে স্ত্রীর করণীয় কী? কিছুক্ষণ ধরে কী ভেবে, শুধু বলল, 'উনি চলে গেছেন।'

নমিতার মা চমকে উঠলেন।—'চলে গেছে? বলিস কিরে? বছরকার দিন রাগ করে না খেয়ে চলে গেল?' বলেই পাগলের মত তিনি ছুটে গেলেন ছাদের সিঁড়ির দিকে—যদি রাগ করে ছাদে গিয়ে বসে থাকে দিব্যেন্দু। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল বড় রাস্তার ওপর যে দরজাটা সচরাচর বন্ধ থাকে সেটা হাঁ হয়ে রয়েছে আর রাস্তার একটা অপরিচিত দৃশ্য আজ খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। তিনি মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়লেন। নমিতাকে কাঁদতে

দেখে তাঁর বুক গুরুগুরু করে উঠেছিল কিন্তু এ তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি যে পুজোর দিন সকলকে এত বড় আঘাত দিয়ে দিব্যেন্দু এত সহজে চলে যাবে ! এই যাওয়া যদি দিব্যেন্দুর শেষ যাওয়া হয় তাহলে নমিতার কী হবে ? কে আশ্রয় দেবে নমিতাকে ? ভাবতে ভাবতে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

কেউ পড়ে গেল তা যেন বুঝতে পেরে মঙ্গলামামী ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী হল রে ?' বিরূপ আর নমিতাও ছুটে গেল বিপদের ইঙ্গিত পেয়ে।

চোখে মুখে কিছুক্ষণ জলের ছিটে দিতে নমিতার মার জ্ঞান ফিরে এল। ধরাধরি করে তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হল তাঁর নিজের বিছানায়। আস্তে আস্তে ঘোর কেটে যেতে প্রথম কথা তিনি বললেন বিরূপকে, 'একবার ইস্টিশানে গিয়ে দেখনা বাবা যদি দিব্যেন্দুকে ফিরিয়ে আনতে পার।'

বিরূপ কোন কথা না বলে কলের পুতুলের মত সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল।

স্টেশনে গিয়ে তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্মে ঢুকে বিরূপ এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে দেখল একটা বেঞ্চিতে দিব্যেন্দু চুপ করে বসে আছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বিরূপ এগিয়ে গেল। দিব্যেন্দু ফিরে তাকাতে বলল, 'বাড়ি চলুন—নমিতার মা ডাকছেন।'

দিব্যেন্দু বেঞ্চি ছেড়ে উঠে গেল। প্ল্যাটফর্ম ধরে হাঁটতে লাগল লক্ষ্যহীন ভাবে। বিরূপ পেছন পেছন চলল। দূরে সিগনাল নেমে গেছে—ডাউন ট্রেন এবার আসবে। যাত্রীরা প্রস্তুত হচ্ছে। দিব্যেন্দু কি বিরূপকে কিছু বলবারই অবসর দেবে না ?

খানিকদূর গিয়ে দিব্যেন্দু দাঁড়িয়ে পড়ল—সেখানে লোক কম। বিরূপ সেই সুযোগে দিব্যেন্দুর খুব কাছে গিয়ে বলল, 'আপনার এমন ভাবে চলে আসাটা উচিত হয়নি।'

—'আমার কী উচিত না উচিত তা কি আপনার কাছে শিখতে হবে?'

—'আপনার রাগ দেখছি এখনও যায়নি। চলুন বাড়ি গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করবেন। বেচারী নমিতা। গানবাজনা ছেড়ে, ঐ নির্বান্ধবপুরীতে বাস করে এমনিতেই তার মন ভেঙ্গে যাওয়া স্বাভাবিক। তার ওপর আপনি এ ভাবে চলে এলে তার মনের অবস্থাটা কী হয় ভেবে দেখুন তো!'

—'আমি তাকে মুক্তি দিতে চাই। আমার অভাবে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে এ কথা আমি মনে করিনা।'

—'মানে?' বিরূপের ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল। 'নমিতার ওপর আপনার দায়িত্বও আপনি অস্বীকার করতে চান না কি?'

—'হ্যাঁ। নমিতা যতদিন আমার স্ত্রী হবার যোগ্য ছিল, ততদিন আমার দায়িত্ব ছিল।'

—'হঠাৎ আজ তাকে আপনার অযোগ্যা স্ত্রী বলে মনে করছেন কেন?'

দিব্যেন্দুর মুখ থেকে যেন বাঁধন ছিঁড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চেহারাটাও তার খানিকটা বদলে গেল। ঘৃণা ও ব্যঙ্গের সঙ্গে মুখবিকৃত করে বিরূপের আপাদমস্তক দেখে সে বললে, 'এ প্রশ্ন আর কেউ করলে শোভা পেত। কিন্তু আপনার মত শিক্ষিত লোকের বোঝা উচিত যে একজন চরিত্রহীন পরস্ত্রীকে যে চোখে দেখে, যে কোন স্বামীর পক্ষে নিজের স্ত্রীকে সে চোখে দেখা সম্ভব নয়।'

দিব্যেন্দুর কথা শুনে বিরূপের কান দুটো লাল হয়ে উঠল। তাহলে কি দিব্যেন্দু এই সন্দেহই করেছে যে সে চরিত্রহীন এবং নমিতা পতিব্রতা নয়? এই মিথ্যা, নীচ, অন্যায় অজুহাত দেখিয়ে সে কি নমিতাকে জন্মের মত ত্যাগ করতে চায়—কাপুরুষের মত পালাতে চায় খিড়কি দরজা দিয়ে?

এর পর দিব্যেন্দুর সঙ্গে কথা বলা অবান্তর। বিরূপ তাই মনে মনে তাকে ধিক্কার দিতে দিতে স্টেশনের বাইরে চলে গেল। দূর থেকে দেখল ডাউন ট্রেন সগর্বে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে।

বিরূপ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে হাঁটতে লাগল সাইকেল ধরে। কোন মুখে সে ফিরে যাবে নমিতাদের বাড়ি? কী কৈফিয়ত সে দেবে দিব্যেন্দুর পলায়নের?

এ সময়ে নিজের মনকে বিশ্লেষণ না করেও শান্তি পাচ্ছিল না বিরূপ। ভাবছিল দিব্যেন্দুর এই কুৎসিৎ সন্দেহের জন্যে সে নিজে কতখানি দায়ী। মায়ার চিঠি পেয়ে যেদিন সে প্রথম নমিতাদের বাড়ি গিয়েছিল সেদিন হয়ত তার ভাল লাগেনি নমিতার মাথায় ঘোমটা-সিঁদুর। হয়ত সে সমর্থন করেনি দিব্যেন্দুর সঙ্গে নমিতার লুকোনো, ঠকানো বিয়েকে। কিন্তু আজ সে গিয়েছিল দিব্যেন্দুর সঙ্গেই দেখা করতে, নমিতার পক্ষ থেকে প্রশ্ন করতে যে দিব্যেন্দু আর কতদিন তাকে এমন অসম্মানের সঙ্গে দাম্পত্যজীবন যাপন করাতে বাধ্য করবে? নমিতার অভিভাবকদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার সুযোগ নিয়ে সে যা আত্মসাৎ করেছে তার হিসেবনিকেশ আর কতদিন ধামাচাপা দিয়ে রাখবে? নমিতার সঙ্গীতপ্রতিভ[illegible] যদি সে চিরদিনের জন্যে অক্রিয় করে দিতে চায়, তবে তার জন্যে কী ক্ষতিপূরণ সে দেবে নমিতাকে? অবশ্য দিব্যেন্দুকে সে আজ অনেক কটুকথা শোনাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা শুধু নমিতার জীবনকে সার্থক করবার জন্যে, নমিতার মন পাবার জন্যে নয়।

শেষপর্যন্ত বিরূপ নমিতাদের বাড়িতেই ফিরে গেল। উঠোনে সাইকেলটা রেখে সে নমিতার মার ঘরে না গিয়ে দালানের ওপর বসে পড়ল। বিরূপ ফিরে এসেছে শুনে মঙ্গলামামী তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ বাবা, দিব্যেন্দুর সঙ্গে দেখা হল?'

সামান্য একটা শব্দ 'হ্যাঁ'—তাও উচ্চারণ করতে বিরূপের সময় লাগল।

—'ও কি কলকাতায় গেল?'

—'হ্যাঁ।'

—'বাবা! ভীষণ বদরাগী ছেলে তো। বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বছরকার দিন এমন করে চলে গেল?'

একটু পরেই সরসী এসে বিরূপকে বলল, 'পিসিমা আপনাকে ডাকছে।'

উনিশ

সারাদিন খাওয়া হয়নি বিরূপের। বাড়ি ফিরতে রোদ পড়ে এল। চাকর দীনু ভাতের থালা নিয়ে বসে বসে শেষকালে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিরূপ আসতে জানা গেল আজ তার পেটেও ভাত পড়েনি। বিরূপ দীনুকে বললে খেয়ে নিয়ে তার জন্যে শুধু এক পেয়ালা চা করতে।

বিরূপ স্নান করে এসে ঘরের সামনে তার ছোট্ট বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে বসল। মাথাটা তখনও ধরে আছে। নমিতার ভাবনা যেন কিলবিল করছে পোকার মত।

দিব্যেন্দু ফিরে আসবেনা বিরূপ তা দিব্যচক্ষুতে দেখতে পাচ্ছিল। তবু নমিতার মাকে সে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছিল যে

দিব্যেন্দুর রাগ পড়ে গেলে সে হয়ত পূজোর মধ্যেই ফিরে আসবে। তবে এও বিরূপ বলেছিল যে নমিতার মা আর নমিতা দুজনেরই উচিত দিব্যেন্দুকে চিঠি লেখা—আর এইটুকু বুঝিয়ে দেওয়া যে নমিতার ওপর যে কারণেই সে রাগ করে থাকুক বিষ্ণুপুরে এসে সব কথা ভাল করে শুনে সে বিচার করুক নমিতার সত্যিই কোন দোষ আছে কি না।

বিরূপ বেশীক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে পারল না। চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে এ-বই ও-বই করে কতকগুলো বই জড় করল—পড়তে পারল না একপাতা। খানিক পরে দীনুকে তাগাদা দিয়ে আধসেদ্ধ ঝোলভাত খেয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে নমিতাদের বাড়ি যাবে কি যাবে না করে বিরূপ ঘর আর বারান্দা করছিল। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছিল কলোনির বাসিন্দাদের নতুন জামাকাপড় পরে যাওয়া আসা। বিরূপের মনে হচ্ছিল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনে পূজো যেন নতুন বছরের আশা জাগিয়েছে। মা দুর্গা যেন বলেছেন, 'ওরে, পাঁজি দেখে নতুন বছর আসে না।'

বিরূপের নতুন কাপড় কেনা হয়ে উঠেনি। হেমাঙ্গিনী টাকা পাঠিয়ে লিখে দিয়েছিলেন ষষ্ঠীর দিন বিরূপ যেন নতুন কাপড় অতিঅবিশ্যি পরে। বিরূপ ভাবছিল মার কথা। মনে মনে বলল 'তুমি তো বলে দাওনি ষষ্ঠীর দিন গায়ে কেউ কলঙ্কের কালি ছিটিয়ে দিলে কী দিয়ে লজ্জা ঢাকব ?'

যাই হোক বিরূপ দেখল যে বাড়িতে বসে থাকলে তার মনের অস্থিরতা বাড়বে বই কমবেনা। সাইকেলটা নিয়ে তাই সে বেরিয়ে পড়ল। যাব-না যাব-না করেও নমিতাদের বাড়িই গেল শেষঅবধি। ভাবল দিব্যেন্দুর যদি কোন খবর থাকে।

নমিতার মা সুস্থ হয়ে উঠেছেন দেখে বিরূপ খুশী হল। কিন্তু বুঝতে পারল যে এবার আনন্দময়ী এ বাড়িতে পায়ের ধুলো দেননি। ছেলেমেয়েরা কেউ গায়ে দেয়নি এক টুকরো নতুন কাপড়। হাসি নেই কারুর মুখে। সারা বাড়িটা যেন নিরানন্দে নুয়ে পড়েছে।

একটা দুটো কথা বলে নমিতার মা অসুস্থতার নাম করে উঠে গেলেন। মঙ্গলামামীও একবার বাইরে এসে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে চলে গেলেন।

বিরূপ বিব্রত বোধ করতে লাগল। সে দোষ দিতে পারল না কাউকেই। কারণ নমিতার মা এবং মঙ্গলামামী নিশ্চয় এটুকু বুঝেছেন যে নমিতার দুর্ভাগ্যের জন্যে বিরূপ দায়ী—তার দোষ থাকুক আর না থাকুক।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বিরূপ সাইকেলটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় পেছন থেকে নমিতার গলা শুনতে পেল, 'শুনুন।'

বিরূপ ফিরে দেখল নমিতা দালানে দাঁড়িয়ে আছে—দূর থেকেই তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমায় কিছু বলবে কি?'

—'হ্যাঁ।'

সাইকেলটা নিয়ে বিরূপ নমিতার দিকে এগিয়ে গেল।

নমিতা গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল, 'চলে যাচ্ছেন কেন?'

বিরূপ কোন জবাব দিতে পারল না।

নমিতা বলল, 'আমার স্বামী ভুল করে আপনাকে যে বদনাম দিয়েছেন, আপনি কি বোঝেন না সে বদনাম আপনার মেনে নেওয়া মানে আমার কতবড় ক্ষতি?'

—'বুঝি বলেই এসেছিলাম।'

—'তবে আবার ফিরে যাচ্ছিলেন কেন?'

—'মনে হল কেউ চাননা যে আমি আর তোমাদের বাড়ি আসি।'

—'কিন্তু আমি চাই।'

বিরূপ ব্যাখ্যা করতে পারল না নমিতার কথার। বুঝতে পারল না তার কী বলা উচিত। চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পরে কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দিব্যেন্দুকে তোমরা চিঠি লিখেছ?'

—'মা লিখেছেন।'

—'তুমিও লিখলে পারতে। ক্ষমা চাইবার জন্যে নয়—দিব্যেন্দুর ভুল ভাঙ্গাবার জন্যে।'

—'ও ধরনের ভুল নিজে না ভাঙ্গলে অন্য কেউ ভাঙ্গাতে পারে না।'

—'কিন্তু দিব্যেন্দু যদি—।'

—'সে যদির কোন শেষ নেই। কিন্তু আপনিও যে যদি মানেন, আমার তা জানা ছিল না। আপনি বিষ্ণুপুরে আছেন জেনে আমার যে কত আনন্দ হয়েছিল আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না। আমি সেদিন ভেবেছিলাম যে আপনার মধ্যে যদির দ্বিধা নেই। আপনি জানেন কী ভাল, কী মন্দ, কী ন্যায়, কী অন্যায়। আমি ভেবেছিলাম আপনি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক ওপরে।'

বিরূপ আশ্চর্য হয়ে গেল নমিতার বাগ্মিতা দেখে। এর আগে এত কথা নমিতার মুখ থেকে বিরূপ শোনেনি। এতদিনে যেন বিরূপ আবিষ্কার করল নমিতাকে, বুঝতে পারল সে কী আশা করে তার কাছ থেকে। নমিতা চায় স্থির লক্ষ্য। দিব্যেন্দু যা করে করুক, সমাজ যা বলে বলুক, নমিতা নিঃসংশয়ে জানতে চায় তার কর্তব্য কী?

বিরূপের পক্ষে নমিতাকে পথ দেখান অত সহজ হল না। হত যদি সে নমিতার বিপদের সঙ্গে জড়িত না থাকত। কিন্তু তোমার কর্তব্য বলতে গিয়ে যেখানে আমার কর্তব্যের কথা ওঠে সেখানে বিরূপ কী উপদেশ দেবে? বড় জোর বলতে পারে,

কলঙ্ক যদি তোমায় আক্রমণ করে আমিও সইব তার বন্য আঁচড়, কিন্তু বলতে পারবে না যে তোমায় আমি বাঁচাব—এতটুকু আঁচ লাগতে দেবনা তোমার বর্ণে।

কুড়ি

বিজয়াদশমীর দিন সকালে মহেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা হতে তিনি বিরূপকে বললেন, 'কী আশ্চর্য! আপনি বিষ্ণুপুরে? অথচ পূজোর মণ্ডপে আপনাকে একদিনও না দেখতে পেয়ে আমরা বলাবলি করছিলাম যে আপনি হয়ত কলকাতায় চলে গেছেন, পূজোর ছুটিটা একেবারে কাটিয়ে ফিরবেন।'

বিরূপ লজ্জিত হয়ে বলল, 'ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই ছুটিটা কাটছে ভাল।'

—'যাক, আজ সন্ধ্যেবেলা কলেজের বিজয়াসম্মেলনে আসছেন তো?'

—'কোথায় হবে?'

—'কেন, চিঠি পান নি?'

বিরূপের মনে পড়ে গেল চিঠির কথা।—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পেয়েছি—যাব—নিশ্চয় যাব।'

বিরূপ মন থেকেই 'যাব' বলেছিল কিন্তু নমিতাদের বাড়ি গিয়ে বিজয়াসম্মেলনে যাবার চেয়ে ঢের বেশী গুরুতর এক কর্তব্যের সঙ্গে তাকে মোকাবেলা করতে হল। বিরূপ শুনল, দিব্যেন্দু স্পষ্টই লিখেছে যে সে নমিতাকে গ্রহণ করতে রাজী নয়—এমন কি স্বীকার করতে রাজী নয় যে নমিতা তার স্ত্রী। নমিতার মা দিশাহারা হয়ে গিয়েছিলেন চিঠিটা পেয়ে। যে গ্লানি লুকোবার জন্যে নমিতার প্রয়াসের অবধি ছিল না তিনি ব্যাকুলরোদনে তা ব্যক্ত না করে শান্তি পাচ্ছিলেন না। পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে প্রায় সকলেই জেনে গেলেন যে নমিতার স্বামী নমিতাকে ত্যাগ করেছে।

বিরূপের কিন্তু আজ নিজের সম্বন্ধে কোন লজ্জা ছিল না। সব অনুভূতির মত লজ্জাও এক অনুভূতি যা নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করার পর বিকল হয়ে যায়। বিরূপের তাই আজ মনে হচ্ছিল যে এর চেয়ে শতগুণে ভাল পরনিন্দার পরোয়া না করে নমিতা আর তার মাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া—তাহলেও নমিতা জানবে যে পৃথিবীর সকল আশ্রয় থেকে সে বঞ্চিত হয়নি—তার পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো এখনও পাটাতনে লেগে আছে।

দিব্যেন্দুর চিঠির প্রথম ধাক্কা সামলে ওঠার পর নমিতার মার মনে হল ললিতবাবুর কথা। নমিতার হিতাকাঙ্ক্ষী তিনি—প্রাণপণ চেষ্টা নিশ্চয় করবেন দিব্যেন্দুকে বোঝাবার। নমিতার মা এই ভেবে সব কথা খুলে ললিতবাবুকে একটা চিঠি লিখলেন। আর বলে দিলেন, দরকার হলে দাদার সঙ্গে পরামর্শ করতে—যদিও, সত্যি কথা বলতে কি, ভূপতিবাবুর পৌরুষের ওপর খুব বেশী ভরসা তাঁর ছিল না।

ললিতবাবু তাঁর কর্তব্যের ত্রুটি করলেন না। দিব্যেন্দুর সঙ্গে বাক্যালাপের স্পৃহা না থাকলেও তিনি দু-দিন দেখা করলেন দিব্যেন্দুর সঙ্গে, পায়ে না ধরে যত অনুরোধ করা যায় তা করলেন শুধু একবার বিষ্ণুপুরে গিয়ে সব কিছু ভাল করে তলিয়ে বিচার করবার জন্যে। কোন ফল হল না। দিব্যেন্দুর সুবুদ্ধি হওয়ার কোন লক্ষণই দেখতে পেলেন না তিনি। ললিতবাবু নিরুপায় হয়ে ভয়ও দেখিয়েছিলেন ঘটনাটা পরিতোষবাবুর কানে তুলবেন বলে, কিন্তু দিব্যেন্দু তাতে ভড়কায় নি। বলেছিল, 'তা যদি করেন তা হলে আপনাকে ধন্যবাদ দেব আমার দুশ্চিন্তা তাড়াতাড়ি লাঘব করে দেবার জন্যে—কারণ, নমিতার সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করার ব্যাপারে আমার বাবা যে আমার চেয়ে ঢের বেশী উৎসাহী হবেন তা হয়ত আপনাকে বলে দিতে হবে না।'

ললিতবাবু অবশেষে ভূপতিবাবুকেও জানালেন সব কথা। শুনে ভূপতিবাবুর মুখ এইটুকু হয়ে গেল। বললেন, 'আপনি ভালই করেছেন পরিতোষবাবুর সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা না করে। নমিতার জীবন তো নষ্ট হয়েছেই—বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করলে আমাদের বংশের আরও দশটা মেয়ের আখেরও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে নমিতা আর তার মা বিষ্ণুপুরেই থাকুক, যেমন মঙ্গলাবৌদি আর তার ছেলেপুলেরা আছে। যদি ভগবানের দয়া হয়, একদিন সব বিপদ আপনিই কেটে যাবে।'

ললিতবাবুর চিঠি পেয়ে, নমিতার মার যেটুকু আশা ছিল তাও শেষ রাত্তিরের পলতের মত নিভে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন যে দিব্যেন্দু নমিতাকে গ্রহণ না করলে, কলকাতায় দাদার সংসারে ফিরে যাবার পথ বন্ধই থাকবে এবং নমিতাকে নিয়ে তাঁকে অর্ধগ্রাস-ছিন্নবস্ত্রে বাকী দিনগুলো কাটাতে হবে মঙ্গলাবৌদির অনাথাশ্রমে।

এর চেয়ে মৃত্যু দাও, বলে ভগবানকে ডাকতে ডাকতে তিনি সত্যিই সাংঘাতিক রোগে শয্যা নিলেন কয়েক দিনের মধ্যেই।

বিরূপ সমস্যায় পড়ল। তার মনে হল তার করবার কিছু নেই। শারীরিক পরিশ্রমের দরকার হলে সে প্রাণপাত করতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তার অর্থবল কই যে সে রুগীর চিকিৎসার ভার নেবে? রোগ কিন্তু তা শুনল না। মঙ্গলামামীর টোটকা ও ভক্তি-চিকিৎসা অগ্রাহ্য করে ক্রমশঃ বেড়েই যেতে লাগল দিনদিন। জ্বরের প্রকোপে নমিতার মা প্রলাপ বকতে শুরু করলেন।

অনোন্যপায় হয়ে বিরূপ শেষে একদিন বাড়ি ফেরবার পথে প্রতুলবাবুর বাংলোর দিকে সাইকেল ঘোরাল।

প্রতুলবাবু সাদর অভ্যর্থনা জানালেন বটে, তবে বলতে ছাড়লেন না—'তাহলে শেষ অবধি নাম রেজিষ্ট্রী করাতে রাজী হলেন!'

বিরূপ বললে, 'এক রকম তাই। দময়ন্তীদেবীর কাছেই দরবার করতে এলাম একটা ব্যাপারে।'

দময়ন্তীদেবী বাড়ি ছিলেন না। বিরূপকে অনেকক্ষণ বসতে হল। প্রতুলবাবু নিজের কজে ব্যস্ত ছিলেন। তার মাঝখানেই দু-একবার এসে ভদ্রতা রক্ষা করে গেলেন।

দময়ন্তীদেবী কারুর মোটরে ফিরলেন। ধন্যবাদ ও বিদায় জানিয়ে জুতোর লঘুশব্দ করতে করতে তিনি ঘরে ঢুকতে, বিরূপ উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। দময়ন্তীদেবী দুটো হাত আর হাতব্যাগটা একই সঙ্গে তুলে পরক্ষণে ব্যাগটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ফেলে রেখে দিলেন একটা টেবিলের ওপর। তারপর ঘাড়ের চুলগুলো আলগা করার জন্যে যেন মাথাটা একবার নেড়ে অন্য

একটা টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন। কয়েকটা চিঠি, সংবাদপত্র ও পত্রিকা টেবিলটার উপর চাপা দেওয়া ছিল। সেগুলো উলটে পালটে দেখে, একখানা চিঠি পেতলের ছুরি দিয়ে খুলে পড়তে পড়তে সোফার উপর এসে বসলেন। চিঠি পড়া শেষ হতে মুখ তুলে বিরূপকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বিজয়াসম্মেলনে আসেন নি কেন?'

—'একটা হাঙ্গামায় আটকে গিয়েছিলাম। সেই হাঙ্গামার ব্যাপারেই আপনার কাছে এসেছি।'

—'পুলিস কেস?'

—'না। একটি নিরাশ্রয় বিধবার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি অসুখ। যদি তার উপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা যায়।'

—'তাঁর বয়স কত? আর কে আছেন? আপনার কোন আত্মীয়া?'

—'বলতে গেলে তাঁকে সাহায্য করার মত কেউ নেই। তবে তিনি আমার মাতৃস্থানীয়া। তাঁর মেয়ে আমার বোনের মত।'

—'ও।' বলে দময়ন্তীদেবী একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'কোথায় থাকেন?'

—'বড় রাস্তার ওপর—স্টেশনে যাবার রাস্তাটা যেখানে মিশেছে তার আগে যে শিব মন্দিরটা আছে, ঠিক তার সামনে।'

—'মানে, চাটুয্যেদের বাড়ি? যে বাড়ির এক মেয়েকে স্বামী ত্যাগ করেছে?'

দময়ন্তীদেবীর কথা শুনে বিরূপ লজ্জায় মাথা হেঁট করল। তার আশ্চর্য লাগল কী করে এত কথা দময়ন্তীদেবী জানতে পারলেন। তবে কি এই ব্যাপারে বিরূপের নামেও কোন অপবাদ তিনি শুনেছেন?

বিরূপের উত্তর দিতে দেরি হওয়ায় দময়ন্তী আবার প্রশ্ন করলেন, 'সেই মেয়েটিই কি আপনার বোনের মত?'

—'হ্যাঁ।'

দময়ন্তীদেবী বিরূপের দিকে একবার চেয়ে বললেন, 'তা যদি হয়, তাহলে—।'

এমন সময় প্রতুলবাবু ঘরে ঢুকতে দময়ন্তীদেবী সংক্ষেপে বিরূপের আসার কারণ তাঁকে জানালেন। শেষে বললেন, 'এ অবস্থায় মেয়েটি ও তার মার একটা ব্যবস্থা করা আমাদেরই কর্তব্য।'

প্রতুলবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করতে চাও ?'

—'আমার মনে হয়, মেয়েটির মাকে সিভিল হাঁসপাতালে ভরতি করিয়ে দিয়ে, মেয়েটিকে আমাদের এখানে এনে রাখতে হয়।'

বিরূপ বললে, 'বাড়িতে মেয়েটির মামীমা তাঁর ছেলেপুলে নিয়ে থাকেন, কাজেই মেয়েটি এখন বাড়িতেই থাকতে পারে। তবে—তার মামীমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, নিজের ছেলেমেয়েদের মুখেই হুবেলা ভাত যোগাতে পারেন না।'

—'তাহলে মেয়েটির এখানে চলে আসতে আপত্তি কী ?'

—'জানিনা চলে আসা বলতে আপনি কী মানে করছেন কিন্তু যে আশ্রয়ে সে ও তার মা রয়েছে তা কোনও দিক থেকে সুখের না হলেও, আমার মতে, ঠিক এ সময়ে সে আশ্রয় ছেড়ে আসা উচিত হবে না।'

প্রতুলবাবু সায় দিয়ে বলে উঠলেন, 'বিরূপবাবুর সঙ্গে আমি একমত।'

দময়ন্তীদেবী কিছুমাত্র চাঞ্চল্য না দেখিয়ে, তাঁর পেণ্টকরা নখগুলোর দিকে চেয়ে বললেন, 'আশাকরি বিরূপবাবু কিছু মনে করবেন না। আমি মেয়েটির সম্বন্ধে নানান কথা শুনেছি বলেই তার সম্বন্ধে আমার খানিকটা কৌতূহল জেগেছে। তাই আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে আমার এখানে কিছুদিন রেখে দেখি যে তার হুর্ভাগ্যের জন্যে সে নিজে কতখানি দায়ী।'

বিরূপ বললে, 'তারপর ?'

—'তারপর একটা ব্যবস্থা করা যেত। সে যাক—। আপনি কালই মেয়েটির মাকে হাঁসপাতালে ভরতি করাবার ব্যবস্থা করুন। আমি ডক্টর নাগকে একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি।' বলে দময়ন্তীদেবী উঠে গিয়ে একটা ছোট টেবিলের সামনে বসে খশখশ করে চিঠি লিখে, চিঠিখানা ভাঁজ করে বিরূপের হাতে দিলেন। বলে দিলেন, 'কাল সকাল দশটার মধ্যে গিয়ে ডক্টর নাগের সঙ্গে দেখা করবেন, তারপর তিনি যা বলেন তাই করবেন।'

বিরূপ ইতস্ততঃ করে বলল, 'টাকাকড়ি কী রকম লাগবে ?'

—'সে ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না।'

বিরূপ দময়ন্তীদেবীকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

প্রতুলবাবু হেসে বললেন, 'দেখলে তো ? ভদ্রলোক যাবার সময় আমার দিকে একবার তাকালেনও না।'

—'তোমার বরাত।' বলে দময়ন্তীদেবী স্বামীর দিকে অনুরাগের দৃষ্টিপাত করে হাসলেন।

একুশ

নমিতার মাকে হাঁসপাতালে ভরতি করিয়ে দিয়ে বিরূপ অনেকখানি নিশ্চিন্ত হল।

ডক্টর নাগের আন্তরিকতা দেখে বিরূপ সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল—আর সে জন্যে দময়ন্তীদেবীকে সে মনে মনে শ্রদ্ধা

না করে পারছিল না। নাম লেখাবার জন্যে যেখানে লাইন দিতে হয়, সিট পাবার জন্যে যেখানে সুপারিশ করতে হয়, চিকিৎসকের দর্শন পাবার জন্যে যেখানে দুবেলা চীৎকার করতে হয়, সেখানে দময়ন্তীদেবীর এক ছত্র হাতের লেখা যে রোগিণীর মর্যাদা অতখানি বাড়িয়ে দেবে, বিরূপ তা আশা করেনি। সকলের আগ্রহ ও যত্ন দেখে নমিতার মার রুগ্ন ঠোঁটেও যে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছিল তার মূল্য অনেক। বিরূপ নিজেকে ধন্য মনে করেছিল।

কদিন ধরে ডক্টর নাগ নিজের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করেও কোন সুফল পেলেন না। সেদিন সকালে বিরূপ হাঁসপাতালে পৌছতেই ডক্টর নাগ তাকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'আমি সন্দেহ করছি টাইফয়েড পারফোরেশান। অবস্থা খুব ভাল নয়। আজই অপারেশানের ব্যবস্থা করতে হবে।'

বিরূপের করবার কিছু ছিল না। শুধু ডক্টর নাগের কথামত কয়েকটা কাগজে সই করে সে নমিতাদের বাড়ি গেল। নমিতাকে দেখে যথাসম্ভব সহজ হবার চেষ্টা করে বললে, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে হাঁসপাতালে চল। মাসিমার আজই অপারেশান হবে— তোমায় দেখলে মনে একটু সাহস পাবেন।'

মঙ্গলামামী খবর শুনে কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। তাঁর ছেলেমেয়েরাও ঠিক বুঝতে পারল না তাদের পিসিমা আছেন কি নেই।

বলাবাহুল্য, নমিতার খাওয়া হল না। সে বিরূপের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার মনে হতে লাগল যে বিরূদা যে সংবাদ বহন করে এনেছে তা মৃত্যুসংবাদেরই নামান্তর।

যাই হোক, বিরূপ নমিতাকে নিয়ে যখন হাঁসপাতালে পৌছল তার কিছুক্ষণ আগেই নমিতার মাকে অপারেশান থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মার সঙ্গে দেখা না হতে নমিতা ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলল। বিরূপ সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'চল তোমায়

আমাদের কলেজের কলোনি দেখিয়ে আনি। ফেরার পথে আবার হাঁসপাতাল হয়ে যাবখন।'

বিরূপের সেদিন কলেজ যাওয়া হল না। নমিতাকে নিয়ে কলেজের কলোনিতে পৌঁছে একটা খবর পাঠিয়ে দিল মহেশ্বরবাবুর কাছে, তারপর প্রতুলবাবুর বাড়ির দিকে এগোল। সেটা প্রতিবেশীর বাড়ি যাওয়ার পক্ষে প্রশস্ত সময় না হলেও বিরূপের মনে কোন দ্বিধা ছিল না।

বেলা অনেক হয়েছিল। প্রতুলবাবু অনেকক্ষণ কলেজে চলে গিয়েছিলেন। বিরূপ খবর দিতে দময়ন্তীদেবী এলোচুলে শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। বিরূপ কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করে বলল, 'নমিতার মার আজ অপারেশান করা হচ্ছে। আমরা হাঁসপাতালে পৌঁছবার আগেই তাঁকে অপারেশান থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নমিতাকে তাই আপনার কাছে নিয়ে এলাম।'

—'বেশ করেছেন।' বলে দময়ন্তীদেবী ড্রয়িংরুমের জানলাদরজা খুলে বিরূপ আর নমিতাকে বসতে বললেন।

নমিতার সঙ্গে দময়ন্তীদেবী অনেক কথা বললেন। নমিতা জন্মাবার পর থেকে তার জীবনে যা যা ঘটেছে তা প্রায় সবই তিনি জেনে নিলেন নমিতার মুখ থেকে। শুধু জিজ্ঞেস করলেন না তার স্বামীর কথা। ভাল গান গাওয়া নমিতার একটা উল্লেখযোগ্য গুণ শুনে খুশী হয়ে বললেন, 'আজ সন্ধ্যেবেলা তোমার গান শুনব।'

বিকেল হতে প্রতুলবাবু কলেজ থেকে ফিরলেন। বিরূপকে দেখে বললেন, 'কলেজ না গিয়ে প্রাইভেট টিউশানির হাতেখড়িটা কি আজ আমার বাড়িতেই করলেন?'

প্রতুলবাবু যে রসে কথা আরম্ভ করেছিলেন তা বদলে গেল তিনি যখন নমিতাকে দেখতে পেলেন এবং তার মার অপারেশানের খবর শুনলেন। শেষে নমিতার সঙ্গে দু-একটা কথা বলে তিনি ঘরের ভেতর চলে গেলেন।

খানিক পরে চা এল। প্রতুলবাবুও বেশ পরিবর্তন করে এসে বসলেন।

চা খাওয়া শেষ হতে দময়ন্তীদেবী নমিতাকে বললেন, 'ওঠো, মুখ হাত ধুয়ে নেবে চল। জামাকাপড় তোমার ভালই আছে, শুধু একটু ঘুরিয়ে ঠিক করে পরে নিও। একটু পরে আমাদের এখানে কয়েকজন অতিথি আসবেন। তাঁদের সামনে তোমায় গান গাইতে হবে।'

নমিতার ভারি নতুন লাগছিল দময়ন্তীদেবীকে। তিনি ঠিক এমনই যে তাঁর আদেশ পালন করতে যেন ভালই লাগে!

দময়ন্তীদেবীর সঙ্গে নমিতা ভেতরে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে সে ফিরে এল, দময়ন্তীদেবীর আগেই, যেন অন্য মানুষ। কোন রঙিন প্রসাধন সে করেনি—তার পরনের কাপড়খানাই দময়ন্তীদেবী পরিয়ে দিয়েছেন অন্য ধরনে, আর চুলটা বেঁধে দিয়েছেন নতুন কায়দায়। তাইতেই বিরূপ যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না যে নমিতাকে সত্যিই দেখতে এত ভাল, তার অবয়বে সত্যিই এত লাবণ্য! দময়ন্তীদেবী কয়েক মিনিট পরেই এলেন। রুজ-লিপষ্টিক, সাজসজ্জায় নিখুঁত সুন্দরী—মিসেস মিত্র বলে যাঁর সঙ্গে বিরূপের পরিচয় হয়েছিল সত্যেনের বাড়িতে।

বিরূপ হেসে বললে, 'এক ঘণ্টায় এত পরিবর্তন? নমিতা আপনার কাছে কিছুদিন থাকলে না জানি কী হত!'

প্রতুলবাবু বললেন, 'আপনকে সাবধান করে দিই। আমার স্ত্রীর এ গুণ দেখে বুদ্ধির সঙ্গে শত্রুতা করবেন না। এটা হল ওঁর মরীচিকা সৃষ্টি করার ক্ষমতা। যারা ঠেকে শিখেছে তারা জানে যে ওঁর ভেতর শুধু বালির উত্তাপ।'

বিরূপ মুগ্ধ হয়ে উত্তর দিল, 'বালি না হলে হোম হয় না।'

কিছুক্ষণ পরেই অতিথিদের সমাগম হতে লাগল। দময়ন্তীদেবীর ড্রয়িংরুমে এক নতুন মুখ দেখে অনেকেই অবাক হলেন। নমিতা

পরিচিত হল বিরূপের বোন মিসেস চৌধুরী বলে। দময়ন্তীদেবী নমিতার গান না শুনেই তার গানের সুখ্যাতি করে ফেললেন। বিরূপের কথার ওপর নির্ভর করে বললেন, 'কলকাতার মতন সহরে নমিতা যখন অত নাম করেছে তখন বিষ্ণুপুরে ও তো সাক্ষাৎ সরস্বতী।'

বলাবাহুল্য, এর পর নমিতার গান শোনার বাসনাই হয়ে দাঁড়াল সেদিনকার পার্টির আকর্ষণ, এবং সকলের পীড়াপীড়ি ও দময়ন্তীদেবীর ভৎসনায় নমিতা অনতিবিলম্বে গান শুরু করতে বাধ্য হল।

নমিতার মন পড়েছিল হাঁসপাতালে। এই অচেনা আবহাওয়ায় নানা রকমের মুখ, নানা রকমের সাজ, নানা রকমের কথাবার্তা যেন তার ধ্যানভঙ্গ করে দিচ্ছিল বারে বারে। আজ তার গান গাইতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না। তা ছাড়া অনেকদিন গান না গাওয়ার ফলে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিল সে। কী গাইবে? হয়ত গানের সব কথা তার মনে পড়বে না—হয়ত বা দময়ন্তীদেবীর প্রশংসার যোগ্য হবে না তার গান।

ভয়, সঙ্কোচ, লজ্জা অতিক্রম করে নমিতা শেষকালে দময়ন্তীদেবীকে বলল যে তিনি যদি দয়া করে হারমোনিয়ম অথবা অর্গ্যান বাজান, তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইবে সে। দময়ন্তীদেবী আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়ে অর্গ্যানের টুলে গিয়ে বসলেন।

নমিতা একটি গানই গাইল—অনেকক্ষণ ধরে। মীরার ভজন। শুধু উপস্থিত শ্রোতাশ্রোত্রীদের শোনাল না, যেন গিরিধারী গোপালকেও শোনাল।

গান শেষ হতে দময়ন্তীদেবী আর থাকতে পারলেন না। নমিতাকে জড়িয়ে ধরলেন দু-হাতে।

রসভঙ্গ হল। হাঁসপাতাল থেকে কে একজন চিঠি এনেছে বিরূপের নামে। বিরূপ তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেল। ডক্টর

নাগের চিঠি। লিখেছেন, 'ছটা বেজে পঞ্চান্ন মিনিটে সুখলতাদেবী মারা গেছেন।'

নমিতাকে নিয়ে বিরূপ চলে যাচ্ছিল। দময়ন্তীদেবী সিঁড়ির কাছে এসে নমিতার পিঠে হাত দিলেন। নমিতা আর থাকতে পারল না। দময়ন্তীদেবীর কাঁধের নীচে মাথা গুঁজে আকুল হয়ে কেঁদে উঠল। দময়ন্তীদেবী নমিতার মাথায় শুধু হাত বুলোতে লাগলেন। কয়েক মিনিট কোন কথা বলতে পারলেন না।

নমিতা একটু শান্ত হতে দময়ন্তীদেবী বিরূপকে বললেন, 'আপনারা এগোন—সৎকারের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন এমন কয়েকজনকে আমি হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বাইশ

সুখলতাদেবীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হল। শ্রাদ্ধে ভূপতিবাবু এসেছিলেন। যাবতীয় ব্যয় তিনিই বহন করলেন। যাবার আগে নমিতার হাতে দশটা টাকাও দিয়ে গেলেন। কিন্তু নমিতার কলকাতা যাওয়ার কথা একবারও উচ্চারণ করলেন না।

মঙ্গলাবৌদি নমিতার ভাতকাপড়ের প্রসঙ্গটা একবার তুলেছিলেন। ভূপতিবাবু এড়িয়ে গেলেন। নমিতা একটা মানুষ, তাও মেয়েমানুষ। মঙ্গলাবৌদির সংসারে অভাব-অনটনের মধ্যে

সে কোন রকমে মাথা গুঁজে থাকবেখন। তবে কলকাতায় ফেরবার দিন তিনি মঙ্গলাবৌদিকে বলে গিয়েছিলেন নমিতাকে সব সময়ে চোখে চোখে রাখতে—আর বিরূপ বলে যে ছোকরাটি শ্রাদ্ধবাড়িতে ঘরের ছেলের মত ঘোরাফেরা করছিল, নমিতার সঙ্গে তার মেলামেশা একেবারে বন্ধ করে দিতে।

বিরূপ ভূপতিবাবুর হুকুমজারির জন্যে প্রস্তুত ছিল না। কাজ মিটে যাবার পর একদিন নমিতাদের বাড়ি গিয়ে তাকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল। নমিতা দেখা করতে এল না। অবশেষে মঙ্গলামামী দেখা দিলেন। বললেন, 'দেখ বাবা, তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, অনেক লেখাপড়া শিখেছ, তোমায় আর আমি কী ভদ্রতা শেখাব? কিন্তু তোমায় আমি না বলেও পারছি না যে নমির মা মারা যাবার পর তোমার আর এ বাড়িতে আসা ভাল দেখায় না। নমির স্বামী অমন করে চলে যাবার পরও, নমির মার খাতিরে তোমায় আমি কোন কথা বলিনি, কিন্তু এখন তোমাকে ঘন ঘন এ বাড়িতে আসতে দেখলে পাড়ার লোক আর মানবে না। নমির যা হবার তা তো হয়েছেই, এবার সরসীর মুখ চেয়ে আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। তাই এতগুলো কথা আমায় বলতে হল।'

মঙ্গলামামীর কথার সবটা না শুনেই বিরূপ শেষবারের মত চলে গেল।

আর সে এ বাড়িতে ঢুকবে না তা ঠিক, কিন্তু নমিতার দুর্দশায় তার কর্তব্য, তার দায়িত্ব, সব কি এরই সঙ্গে মিটে গেল? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে না পেয়ে বিরূপ বিরক্ত হল নমিতার ওপর। তার মনে হল নমিতার মধ্যে বাঁচবার শক্তি নেই, শুধু বিলীন হয়ে যাবার ঔদাসীন্য আছে। তাই সে স্ফুলিঙ্গের মত শুধু একদিন জ্বলে উঠেছিল—যেদিন বিরূপকে সে বলেছিল যে তার স্বামীর দেওয়া বদনাম বিরূপের মেনে নেওয়া মানে তার অতিবড় ক্ষতি—

যেদিন সে বলেছিল যে তাদের বাড়ির আর সকলে না চাইলেও সে চায় যে বিরূপ তাদের বাড়ি আসুক। সেই এক মুহূর্তের জ্বলে ওঠা নমিতাকে বিরূপ অগ্নিক্রান্তা সীতা বলে ভুল করেছিল। সেই নমিতাকেই সে বাঁচাতে চেয়েছিল।

কিছুদিন পরে দময়ন্তীদেবী বিরূপকে জিজ্ঞেস করলেন নমিতার খবর। নমিতাকে যে তাঁর ভাল লেগেছিল তা বোঝা গেল, যখন বললেন, 'অত সরল মেয়েকে স্বামী ত্যাগ করবে এ আর নতুন কথা কী?'

বিরূপ বললে, 'আমার মনে হয় এই রকম সরল মেয়েরা দুঃখ পেতে ভালবাসে বলে তাদের কপালে দুঃখ ঠিক জুটে যায়।'

—'এটা আপনার অভিমানের কথা। দেখুন, সত্যিকারের মানুষ হতে গেলে অনেকগুলো গুণের দরকার হয়, যেমন কর্তব্যজ্ঞান, সাহস, বুদ্ধি, শিক্ষা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি। কিন্তু মজা হল এই যে কেবল একটি গুণের অভাবে যে কোন মানুষ সর্বস্বান্ত হতে পারে, যেমন রাবণ সব দেবদেবীকে নিজের দলে টেনেও এক বিষ্ণুর অভাবে সর্বস্বান্ত হয়েছিল।'

—'গুণেরও একটা সীমা থাকা দরকার। গুণের বাড়াবাড়ি হলে আবার দুর্দশার সীমা থাকে না। যেমন ধরুন নমিতার সহ্যগুণ। নমিতা ইচ্ছে করলে অনায়াসে গান গেয়ে, গান শিখিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারত। মা বেঁচে থাকতে যদি সে চেষ্টা করত, হয়ত এত তাড়াতাড়ি মাকেও হারাত না। কিন্তু নমিতা তা চায় না। তার কাছে চরম দারিদ্র্য, চরম লাঞ্ছনা যেন কিছুই নয়—যেহেতু সহ্য করবার যথেষ্ট ক্ষমতা তার আছে।'

বিরূপ ঠিকই বলেছিল। নমিতা যে অপরিসীম সহ্যগুণ নিয়ে জন্মেছিল তাতে কোন ভুল ছিল না। নমিতার মা মারা যাবার

পর ভূপতিবাবু যখন নমিতাকে মঙ্গলামামীর ঘাড়ে একরকম চাপিয়ে দিয়ে চলে গেলেন মঙ্গলামামী নির্দিষ্ট অন্নের অতিরিক্ত ভাগ অত সহজে ছেড়ে দিলেন না। উঠতে বসতে নমিতাকে শোনাতে লাগলেন যে নমিতা যা মুখে দিচ্ছে তা পাঁচজনকে বঞ্চিত করা অন্ন। নমিতা কোন প্রতিবাদ জানাল না। উপবাস এবং অপবাদ দুই-ই স্বীকার করে সে দিন কাটাতে লাগল।

কিন্তু মঙ্গলামামীর এমন দিনও আসত যখন নমিতার ভাগ না রেখেও বাকী পাঁচজনের অন্ন বাড়ন্ত হয়ে যেত আর চিঠির পর চিঠি লিখেও ভূপতিবাবুর কাছ থেকে কোন টাকা পাওয়া যেত না।

কয়েকবার এই ভাবে অনশনের সঙ্গে যুদ্ধ করে মঙ্গলামামী অন্য রাস্তা ধরলেন। তিনি হঠাৎ নমিতাকে স্নেহযত্ন করতে শুরু করে দিলেন এবং তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে নারীর বসনভূষণই দুর্দিনের সহায়—আর ভগবানের আশীর্বাদে দিব্যেন্দু এই অল্প সময়ের মধ্যে নমিতাকে যত বস্ত্রঅলঙ্কার উপহার দিয়েছে তা বেচলে তার শুধু এ জন্মের কেন পরজন্মের ভরণপোষণও অক্লেশে নির্বাহিত হয়ে যেতে পারে।

মঙ্গলামামীর কথা শুনে নমিতার মনে হল দিব্যেন্দুর দেওয়া সব জিনিসপত্র, গয়নাকাপড় তাঁর হাতে এখনই তুলে দিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। সত্যিই তো! তার কী অধিকার আছে দিব্যেন্দুর দানের ওপর? বরঞ্চ, দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়, গায়ে দিলে কাঁটার মত বেঁধে।

নমিতা এই ভেবে একে একে কাপড়, নয়ত বাসন, নয়ত গয়না মঙ্গলামামীর হাতে তুলে দিতে লাগল আর মঙ্গলামামী পরমানন্দে সেগুলো বিক্রি করে অথবা বন্ধক দিয়ে সংসারের অভাব মেটাতে লাগলেন।

এই যে পন্থা আবিষ্কৃত হল তাতে ক্রমশঃ এই ব্যবস্থাই কায়েমী হয়ে দাঁড়াল যে যতদিন নমিতা তার নিজের সম্পত্তির মায়া ত্যাগ

করে মঙ্গলামামীর সংসারের দুঃখমোচন করতে পারবে, ততদিনই তার সম্মানের সঙ্গে দুবেলা আহার জুটবে।

নমিতার তাতে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু দেখা গেল যে অভাবগ্রস্ত সংসারের অসংখ্য দাবি সহজে মিটে যাবার ফলে, খরচের বাঁধাবাঁধিও দিনদিন ঢিলে হয়ে যাচ্ছে আর মঙ্গলামামীর স্বচ্ছলতার ওপর নজর পড়ছে প্রতিবেশিনীদের। কেউ কেউ মঙ্গলামামীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁলা, নমির বর বুঝি টাকা পাঠিয়ে নমির মন পাবার চেষ্টা করছে?'

প্রকট মিথ্যা হলেও কথাটা নমিতার কানে মধুবর্ষণ করেছিল। তার মনে হয়েছিল পাড়াপ্রতিবেশীদের যতদিন এ ভুল ধারণা থাকে থাকুক না—মন্দ কী? অন্ততঃ সেই কটা দিন তো সে ময়ূরীর মত মাথা উঁচু করে সকলকার দিকে তাকাতে পারবে!

এমনি করে নমিতা যখন সব-হারাবার-খেলা খেলে দিন কাটাচ্ছিল, দময়ন্তীদেবী হঠাৎ একদিন নমিতাদের বাড়ি এসে নমিতাকে বাক্স-প্যাঁটরা সমেত গাড়িতে তুললেন তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে। মঙ্গলামামী, তাঁর ছেলেপুলে ও পাড়াপ্রতিবেশীদের শুধু বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে থাকতে দেখা গেল। দময়ন্তীদেবীকে একটা প্রশ্ন করতে সাহস হল না কারুর।

নমিতাও হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল দময়ন্তীদেবীর কাণ্ড দেখে। অবশ্য সে বুঝেছিল যে দময়ন্তীদেবী তাকে মঙ্গলামামীর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন তারই মঙ্গলের জন্যে।

বাড়ি পৌঁছে দময়ন্তীদেবী নমিতাকে বললেন, 'তোমায় একটা প্রশ্ন করব। ঠিক ঠিক জবাব দেবে?'

—'দেব।'

দময়ন্তীদেবী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সংসারে তোমার সত্যিকারের আপন বলতে কে আছে?'

নমিতা মাথা নীচু করে বসে রইল। দময়ন্তীদেবী একটু পরে বলে উঠলেন, 'কই? জবাব দিলে না তো!'

নমিতার ঠোঁট কেঁপে উঠল। বললে, 'কেউ না।' তিনটি অক্ষর উচ্চারণ করতে যন্ত্রণায় তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল।

দময়ন্তীদেবী সস্নেহে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'তাহলে আজ থেকে তুমি আমার কাছে থাকবে, মনে করবে আমি তোমার দিদি। আমায় 'দিদি' বলে ডাকবে—কেমন?'

নমিতা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। বুঝতে পারল না দময়ন্তীদেবীর অযাচিত আশ্রয় এক কথায় গ্রহণ করা তার পক্ষে অন্যায় হবে কি না। বললে, 'আমার মামা যদি রাগ করেন? তাছাড়া মঙ্গলামামী; সরসী, ভুলো সকলে হয়ত ভাববে যে—।'

দময়ন্তীদেবীর ভুরু দুটো বেঁকে উঠল। বললেন, 'কী ভাববে? ভাববে যে তোমার কাপড়চোপড় গয়নাগাটি সব শেষ হতে যেটুকু বাকী আছে তাও ওদের না দিয়েই তুমি কেন চলে এলে—এই তো?'

নমিতা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ সব কথা আপনাকে কে বলল?'

—'যেই বলুক, তোমার তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তুমি এখন এখানেই থাক। তোমার মামা যদি রাগ করেন আমি বুঝব। তুমি মনে কর এইটেই তোমার বাড়ি। খাও দাও, লেখাপড়া কর, গান গাও।'

সন্ধ্যাবেলা দময়ন্তীদেবী মঙ্গলামামীকে চিঠি লিখে জানালেন যে নমিতা এখন তাঁর কাছেই থাকবে—নমিতার জন্যে মঙ্গলামামী যেন চিন্তা না করেন। দময়ন্তীদেবী চিঠিখানা বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন, কী খেয়াল হল, আর একবার পড়ে নামের তলায় লিখে দিলেন 'দিব্যেন্দুর দিদি।'

দিব্যেন্দুদের সঙ্গে দময়ন্তীদেবীর সত্যিই আত্মীয়তা ছিল তবে নিকট নয়। এও সত্যি যে সম্পর্ক খুঁজে বার করলে দিব্যেন্দুর তিনি দিদিই হতেন। কিন্তু দিব্যেন্দুরা কায়স্থ একথা যে মঙ্গলামামী নাও জানতে পারেন দময়ন্তীদেবী তা ভেবে দেখেন নি।

মঙ্গলামামী বুঝতে পারলেন না কী করে দময়ন্তীদেবীর পক্ষে দিব্যেন্দুর দিদি হওয়া সম্ভব। চিঠি পাওয়া মাত্র পাড়ায় রীতিমত সোরগোল বাধিয়ে ফেললেন। তার ফলে সেই রাত্রেই পাড়ার কয়েকজন ভদ্রমহোদয় একজোট হয়ে সিংহি সাহেবের কাছে গিয়ে আর্জি পেশ করলেন—এর একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। তাঁরা এও বললেন যে নমিতার মঙ্গলামামীমা মনে করেন যে তিনি বিরূপবাবুকে তাঁদের বাড়িতে আসতে বারণ করায় বিরূপবাবুই দময়ন্তীদেবীর সাহায্যে নমিতাকে জোর করে তার যথার্থ অভিভাবিকার আশ্রয় থেকে বার করে নিয়ে গেছেন।—একে নারীহরণ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

সত্যেন সব শুনে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়ল। বললে, 'আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি আধঘণ্টার মধ্যে ঘুরে আসছি।'

সত্যেন দময়ন্তীদেবীর বাড়ি পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গে বিরূপকে খবর পাঠাল। দময়ন্তীদেবী সব কথা শুনে রেগে আগুন হয়ে উঠলেন মঙ্গলামামীর ওপর। বললেন, জিদ তাঁরও আছে—নমিতাকে কিছুতেই ফিরে যেতে দেবেন না তিনি—তার জন্যে তাঁকে ফৌজদারি মামলার আসামী হয়ে লড়তে হয় তাও স্বীকার।

সত্যেন রীতিমত ঘাবড়ে গেল। বললে, 'দেখুন, এটা মফস্বল। এখানে এই নিয়ে একটা গণ্ডগোল বাধলে মিসেস চৌধুরী তো শান্তিতে বাস করতে পারবেনই না, তাছাড়া বিরূপের নামে, এমন কি আপনাদের কলেজের নামে, একটা বিশ্রী বদনাম রটে যাবে।'

বলতে বলতে বিরূপ এসে পড়ল। একটা গুরুতর আলোচনার ইঙ্গিত পেয়ে প্রতুলবাবুও শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন।

দময়ন্তীদেবী কারুর দিকে দৃকপাত না করে উত্তেজনার সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আপনি ভুল করছেন মিস্টার সিনা। এখন যদি অভিযোগকারীদের কথামত নমিতাকে তার মামীমার হাতে সমর্পণ করে দেওয়া হয় তাহলে যে-অপবাদের ভয় আপনি করছেন তা ঢাকা তো পড়বেই না, বরঞ্চ তার জিহ্বা আরও রসাল ও ধারাল হয়ে উঠবে। তাছাড়া, এত বড় অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়াতে আমি রাজী নই।' একটু থেমে দময়ন্তীদেবী আবার বলতে লাগলেন, 'আরও রাজী নই এইজন্যে যে, নমিতাকে লুকিয়ে বিয়ে করে যে তাকে কাপুরুষের মত ত্যাগ করে চলে গেছে, দূরসম্পর্কে সে আমার ভাই হয়। আজ আমি কলকাতা থেকে এক আত্মীয়ের চিঠি পেয়ে জানলাম যে সে আবার বিয়ে করছে। এ অবস্থায় আমার প্রথম কর্তব্য নমিতার ভার নেওয়া। যদি তার অমানুষ স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে বন্ধ করতে পারি তো ভাল, নয়ত আমিই তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে প্রস্তুত থাকব। অবশ্য, নমিতা যদি চায় সে তার মামীমার কাছে ফিরে যেতে পারে, এবং ইচ্ছে করলে তার স্বামীর বিরুদ্ধে মামলাও করতে পারে।'

নমিতা দরজার আড়াল থেকে সব কথা শুনছিল। দিব্যেন্দু আবার বিয়ে করছে এ মর্মান্তিক সংবাদ পেয়ে সে এতটুকু বিহ্বলতা দেখাল না—সহজ ভাবে ঘরে ঢুকে দময়ন্তীদেবীর পাশে গিয়ে বসল। সকলের দৃষ্টি তার ওপর পড়তে নমিতা মাথা হেঁট করে বলল, 'দিদি যা বলবেন, আমি তাই করতে রাজী আছি।'

প্রতুলবাবু গাল থেকে হাতটা সরালেন না। বিরূপের দিকে চেয়ে বললেন, 'বিরূপবাবুর কী মত?'

বিরূপ তুহাতের আঙুলের ডগাগুলো মিলিয়ে বললে, 'এখন যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তাতে বদনাম এড়াবার প্রশ্ন আর নেই। সুতরাং বদনামের সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন রাস্তা তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

সত্যেন বললে, 'একটা রাস্তা আছে। মিসেস মিত্র যদি রাতারাতি মিসেস চৌধুরীকে বিষ্ণুপুর থেকে সরিয়ে নিয়ে যান তাহলে আমি ভদ্রলোকদের বলতে পারি যে দ্বিতীয় বিয়ের খবর পেয়ে মিসেস মিত্র মিসেস চৌধুরীকে নিয়ে কলকাতায় গেছেন বিয়েটা বন্ধ করতে। আমার মনে হয় তাহলে ও পক্ষের আর কিছু বলবার থাকবে না।'

প্রতুলবাবু সমর্থন করলেন। বললেন, 'মিস্টার সিনার হাকিমী বুদ্ধিকে তারিফ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। ওঁর প্রস্তাবের আর একটা যুক্তি হল এই যে বিরূপবাবুর ওপর যে দুর্নাম চাপাবার চেষ্টা করা হচ্ছে তা থেকে বিরূপবাবু সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি পেয়ে যাবেন। কী বল ?' বলে তিনি স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

দময়ন্তীদেবী কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আমার আপত্তি নেই। তবে মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে নমিতাকে কাকাবাবুর পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে আমায় বলতে হবে, 'এই নিন আপনার পুত্রবধূ।' আর তিনি যদি পুত্রবধূকে গ্রহণ না করেন আমাকে আবার নমিতাকে ফিরিয়ে আনতে হবে বিষ্ণুপুরে। — তারপর ?'

সত্যেন বললে, 'আপাততঃ ফৌজদারি মামলার হাত থেকে আপনাদের বাঁচাতে পারলে আমি নিশ্চিন্দি। পরে যদি দরকার হয় মিসেস চৌধুরী ভেবে ঠিক করতে পারেন তিনি কোথায় থাকবেন—আপনার এখানে না ওঁর মামীমার কাছে।'

নমিতা বললে, 'মঙ্গলামামীমা আমার অভিভাবিকা নন। দরকার হলে আমার আশ্রয় আমি নিজেই খুঁজে নেব।'

বিরূপ চুপ করে থাকতে পারল না। বললে, 'সে আশ্রয় তো এখনও খুঁজে নিতে পার। চেষ্টা করলে নিজের পায়েও তুমি দাঁড়াতে পার। তবে অনর্থক কলকাতায় গিয়ে অপমানিত হবার দরকারটা কী ?'

প্রতুলবাবু পাশেই বসেছিলেন। বিরূপের পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'কলকাতায় না গিয়ে উপায় নেই বিরূপবাবু। স্বামী থেকেও চিরদিনের মত স্বামী হারাবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করতেই হবে।'

অতঃপর সেই ব্যবস্থাই পাকা হল। ঠিক হল পরদিন ভোরে দময়ন্তীদেবী নমিতাকে নিয়ে মোটরে রওনা হবেন। সঙ্গে যাবেন প্রতুলবাবু। সত্যেন মোটর ও ড্রাইভার ঠিক করবার ভার নিল।

বিরূপের বিষ্ণুপুরে থাকাই সাব্যস্ত হল। তা না হলে প্রমাণ হয় না যে নমিতার গৃহত্যাগের ব্যাপারে সে নেই।

তেইশ

দময়ন্তীদেবীর ইচ্ছে ছিল কলকাতায় পৌঁছে নমিতাকে নিয়ে সোজা উঠবেন তাঁর কাকাবাবু অর্থাৎ পরিতোষবাবুর বাড়ি। নমিতা ভয় পেয়ে গেল। দময়ন্তীদেবীকে অনুরোধ করল আগে তার মামার কাছে একবার নিয়ে যেতে। দময়ন্তীদেবী আপত্তি করলেন না।

ভূপতিবাবু বাড়িতেই ছিলেন। নমিতা গিয়ে প্রণাম করতে তাঁর হঠাৎ কী দরকারী কাজের কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জামা গায়ে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দময়ন্তীদেবী আর প্রতুলবাবু এসেছেন শুনে আবার জামা খুললেন। ভারি

পায়ের চটির শব্দ করতে করতে নীচে নামলেন। একতলার ঘরে ঢুকে ভুরু কুঁচকে বললেন যে এ নিয়ে হই চই করার ইচ্ছে তাঁর নেই এ কথা তিনি আগেই জানিয়েছিলেন।

দময়ন্তীদেবী রেগে গেলেন। বললেন, 'তাবলে আপনি নমিতার সর্বনাশ চেয়ে চেয়ে দেখবেন, অথচ তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন না?'

—'কে কাকে বাঁচায় বলুন?' ভূপতিবাবুর মাথায় ঢুকল না তিনি কী করে নমিতাকে বাঁচাবেন।—জিজ্ঞেস করলেন, তিনি যদি পরিতোষবাবুকে গিয়ে বলেন যে নমিতাকে তাঁর পুত্রবধূ বলে মেনে নিতেই হবে, তাহলেই কি পরিতোষবাবু ঢাক-ঢোল বাজিয়ে নমিতাকে ঘরে তোলার ব্যবস্থা করবেন?

—'সে পরের কথা। কিন্তু দিব্যেন্দুর দ্বিতীয় বিয়েটা তো বন্ধ করতে পারেন!'

ভূপতিবাবু অপরাধীর মত নমিতার দিকে তাকালেন। তারপর প্রতুলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন যে জোর করে বিয়ে বন্ধ করতে গেলে পরিতোষবাবু হয়ত উলটো চাপ দেবেন—বলবেন দিব্যেন্দুর সঙ্গে নমিতার বিয়ের কোন মূল্যই নেই—নয়ত মূল্য ধরে দেবার নাম করে ভিক্ষে দিতে চাইবেন—। আর আইন আদালতের কথা তুলে কোন লাভ নেই। কারণ তাঁর সে সামর্থ্যও নেই, বুকের পাটাও নেই। এখনও পাঁচটি মেয়েকে পার করার জন্যে তাঁকে গলবস্ত্র হয়ে লোকের দোরে দোরে ঘুরতে হবে। তিনি কী করে পরিতোষবাবুর মত লোকের গলায় গামছা দিয়ে টানাটানি করবেন বলুন!

দময়ন্তীদেবী অবাক হয়ে গেলেন ভূপতিবাবুর কথায়। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, দিব্যেন্দু কি রেজিস্ট্রী করে নমিতাকে বিয়ে করেনি?'

ভূপতিবাবু মাথা হেঁট করে বললেন, 'তাড়াহুড়োতে হয়ে ওঠেনি। দিব্যেন্দু বলেছিল পরে রেজিস্ট্রী করে নেবে।'

দময়ন্তীদেবী এবার আর ভাষার বাঁধন রাখতে পারলেন না। বলে উঠলেন, 'আপনাদের মতন লোকেদের গলায় বস্ত্র কেন গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।'

প্রতুলবাবু কথাটা চাপা দিতে যাচ্ছিলেন। ভূপতিবাবু বললেন—একই কথা। গলায় দড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি না মরে গলায় বস্ত্র দিয়ে একটু দেরি করেই না হয় তিনি মরবেন। কিন্তু তাঁর আর কিছু করবার নেই। দময়ন্তীদেবী আর প্রতুলবাবু যদি কিছু পারেন করুন।

প্রতুলবাবু লজ্জা পেয়েছিলেন। বলে উঠলেন, 'আমার স্ত্রী মনে খুব আঘাত পেয়েছেন—ওঁর কথা আপনি ধরবেন না। কিন্তু এটাও বুঝে দেখুন যে এ অবস্থায় আমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকাটাও কোন কাজের কথা নয়।'

ভূপতিবাবু কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। নিজেকে সামলে নেবার পর বললেন. আঘাত কি তিনিই পান নি? কিন্তু কী করবেন? বিধি বিধান দিলে মানুষের সাধ্য কী তা খণ্ডন করে? যাই হোক, প্রতুলবাবুকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, দিব্যেন্দুর কোথায় বিয়ে হচ্ছে তা তাঁরা শুনেছেন কি না।

প্রতুলবাবু আর দময়ন্তীদেবী একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'না।'

ভূপতিবাবু ইতস্ততঃ করে বললেন, যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তাকে নমিতা ছেলেবেলা থেকে চেনে। একদিন ওদের দুজনের এত ভাব ছিল যে একজন আর একজনকে একবেলা না দেখে থাকতে পারত না। নমিতা যদি তাকে গিয়ে সব কথা বলে, তাহলে দিব্যেন্দুর এ বিয়েটা অন্ততঃ ভেঙ্গে যেতে পারে। তবে তার মানে নয় যে দিব্যেন্দুর অন্য কোথাও বিয়ে হবে না।

নমিতার মুখ সাদা হয়ে গেল। তার বুঝতে বাকী রইল না মামা কার কথা বলছেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল বিন্নদার কথা। তাই কি বিন্নদা আপত্তি জানিয়েছিলেন তার

কলকাতায় আসাতে? ভুলোতে চেয়েছিলেন নিজের পায়ে দাঁড়ানর উৎসাহ দিয়ে? বিরুদা কি তাহলে চান যে মায়া আর দিব্যেন্দু সুখী হোক আর নমিতা দূরে সরে যাক? সে কথা তো বিরুদা মুখ ফুটে বললেই পারতেন। বন্ধুর জন্যে নমিতা কি এটুকু স্বার্থত্যাগ করতে পারত না, না এখনও পারে না? যা সে চাইলেই দিত তার জন্যে এ ভাবে ছলনা করার কী দরকার ছিল?

দময়ন্তীদেবী নমিতার মুখের দিকে তাকান নি। ভূপতিবাবুকে বললেন, 'আপাততঃ এ বিয়েটা বন্ধ করলেও ভেবে দেখার খানিকটা সময় পাওয়া যাবে। আমরা বরং নমিতার বন্ধুর কাছেই আগে যাই। তার নাম ঠিকানা—।'

নমিতার মনে হল তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি দময়ন্তীদেবীর হাত ধরে বলল, 'চলুন—আমরা যাই। আমি তার বাড়ি চিনি।'

গাড়ি ছাড়তে না ছাড়তে নমিতা অসহায় ভাবে কেঁদে উঠল। দময়ন্তীদেবী ধমক দিয়ে বললেন, 'কী করছ নমিতা? মন শক্ত কর। বিপদের সময় ভেঙ্গে পড়া মানে বিপদের কাছে হার মানা।'

নমিতা কাঁদতে কাঁদতে বলল যে সে হারই মেনেছে—সে বিষ্ণুপুরে ফিরে যাবে—কলকাতায় আর এক মুহূর্ত থাকতে পারছে না সে।

দময়ন্তীদেবী বিরক্ত হলেন। বললেন, এত কাণ্ড করে তাকে কলকাতায় নিয়ে আসা কি এই জন্যে? তার স্বামী এতবড় অন্যায় করবে আর সে কোন প্রতিবাদ না জানিয়ে শুধু নিজের মুখই ঢেকে রাখবে? তাছাড়া এ তো সুখবর যে দিব্যেন্দু যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে সে নমিতার বাল্যবন্ধু। বাল্যবন্ধুর ওপর সে জোর খাটাবে না তো খাটাবে কার ওপর?

তবু নমিতার কান্না থামল না। সে দময়ন্তীদেবীর পায়ে ধরতে বাকী রাখল শুধু। বলল—এ বিয়েতে হয়ত দিব্যেন্দু আর মায়া সুখী হবে। কিন্তু যদি সে বিয়ে বন্ধ করতে যায় অথচ না পারে, তাহলে মায়া তাকে চিরদিন অভিশাপ দেবে, ঘৃণা করবে, মনে করবে নমিতা নীচ, নমিতা স্বার্থপর, ভাববে দিব্যেন্দু তাকে ত্যাগ করে কোনও অন্যায় করেনি।

বাধ্য হয়ে দময়ন্তীদেবীকে হাল ছেড়ে দিতে হল।

বিষ্ণুপুরে গিয়ে তিনি নমিতাকে বললেন, 'ভেবেছিলাম তোমার দায়িত্বটা কাকাবাবুর ঘাড়ে চাপাব—তা আর হল না। তুমি আমাকে দায়মুক্ত হতে দিলে না।' সত্যেনকে বললেন, 'এবার নমিতার হিতাকাঙ্খীর দল যাই বলুন, আমি নমিতার ভার নিলাম। আপনি ইচ্ছে করলে আমার নামে ওয়ারেণ্ট বার করতে পারেন।'

নমিতা মৌনসম্মতি জানিয়ে দময়ন্তীদেবীর কাছেই রয়ে গেল। মনে হল না মঙ্গলামামীর সংসারে সে আর কোনদিন ফিরে যাবে।

একটা দুঃসংবাদ শুনে কিন্তু দময়ন্তীদেবী, প্রতুলবাবু আর নমিতা তিনজনেরই মুখ শুকিয়ে গেল।—মহেশ্বরবাবু বললেন, বিরূপ চাকরি ও বিষ্ণুপুর দুই-ই ছেড়ে চলে গেছে।

খবর শুনে সব চেয়ে দুঃখ পেলেন প্রতুলবাবু।

নমিতার মুখ ভার হয়ে উঠল অভিমানে। তার মনে হল মায়ার বিয়ের জন্যেই বিরূদা কলকাতায় গেছেন—আর চাকরি ছেড়েছেন নমিতার কাছে মুখ দেখানর লজ্জায়।

চব্বিশ

দিব্যেন্দুর বন্ধুদের মধ্যে তার বিয়ের খবর জানত শুধু রঞ্জিত। একজনকে না জানালে উপায় ছিল না। রঞ্জিতকে তার মধ্যে টানা সুবিধে। কারণ রঞ্জিতদের একটা বাড়ি ছিল পুরীতে, তাই দিব্যেন্দুর বাড়িতে বলতে বাধেনি যে সে প্রত্যেক শনিবার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পুরী যায় সমুদ্রস্নান করতে। কলকাতার বাড়িতেও রঞ্জিতের কোন ঝামেলা ছিল না। তাদের বৃহৎ পরিবার। মস্ত বাড়ি। তার মধ্যে রঞ্জিতের একটা নিজস্ব ঘর ছিল একতলায়। সে ঘরে তার কোন বন্ধু কখন আসছে কখন যাচ্ছে তা নিয়ে বাড়ির কারুর মাথাব্যথা ছিল না। দিব্যেন্দু তাই সুটকেস নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা আসত রঞ্জিতদের বাড়ি। সেখান থেকে বিষ্ণুপুর যাবার জন্যে তৈরী হয়ে চলে যেত স্টেশনে। সুটকেসটা সোমবার অবধি রঞ্জিতের জিম্মাতেই থাকত।

বিষ্ণুপুর থেকে দিব্যেন্দুর চিঠিপত্রও আসত রঞ্জিতের ঠিকানায়।

ষষ্ঠীর দিন বিষ্ণুপুর থেকে রাগ করে চলে এসে দিব্যেন্দুর ভাবনা হয়েছিল রঞ্জিতকে পাবে কি না। সত্যিই আর একটু হলে সে বেরিয়ে যেত। হঠাৎ সন্ধ্যার মুখে দিব্যেন্দুর রুক্ষ মূর্তি আর আধময়লা জামাকাপড় দেখে রঞ্জিত ঘাবড়ে গিয়েছিল। খানিকটা অনুকম্পাও তার হয়েছিল দিব্যেন্দুর জন্যে। নমিতার মত সাধারণ ঘরের মেয়েকে বিয়ে করে দিব্যেন্দু বুদ্ধিমানের কাজ করেনি এ কথা সে গোড়া থেকেই বলে আসছে।

যাই হোক, দিব্যেন্দুর স্যুটকেস খাটের তলা থেকে বার করে তার স্নানের ব্যবস্থা করে দিয়ে রঞ্জিত চা আর সিঙ্গাড়া আনতে দিল।

দিব্যেন্দু স্নান সেরে জামাকাপড় বদলে সুস্থ হয়ে বসবার পর চা-সিঙ্গাড়া এল। খেতে খেতে দিব্যেন্দু একে একে সব কথা বলে ফেলল। নমিতার ওপর তার অবিশ্বাস যে একদিনে জন্মায়নি তা ভাল করে বুঝিয়ে দিল রঞ্জিতকে।

রঞ্জিত গর্বের হাসি হেসে বললে, 'বাব্বা—এই কথাই তোমায় আমি বরাবর বলে আসছি। আমাদের বাপঠাকুরদারা যে বংশ বংশ করে এতদিন লাঠালাঠি করে মরলেন তা একেবারে বেকার নয়। তুমি জন্মেছ এক বংশে, যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা, আচারব্যবহার একরকম। আর তুমি খাপ খাওয়াতে গেলে আর এক বংশে যাঁদের সবকিছুই অন্যরকম। এত বড় দুঃসাহসের কাজ বৈজ্ঞানিকেরাও করেন না। তাঁরাও পদার্থের সংহতি করবার সময় ভেবে দেখেন যে দুটো বিভিন্ন পদার্থের মিলন হওয়া সম্ভব কি না। আবার দেখ, ক আর খ জোড়া যায়না বলেই ক আর ষ মিলিয়ে যুক্তাক্ষর বানান হল। সেও ঐ একই ব্যাপার। আর তুমি যদি বল আমি ব্যাকরণ মানব না, পাটীগণিত মানব না, প্রকৃতি মানব না, তাহলে তুমি যা পেয়েছ তাকেই সাচ্চা মনে করে সন্তুষ্ট থাক, আবার তাকে ঝুটো প্রমাণ করে খামকা মনের অশান্তি বাড়িয়ে লাভ কী?'

দিব্যেন্দু জবাব দিতে পারল না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। বাড়ি গিয়ে চোরের মত চুপি চুপি নিজের ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল।

এরপর দিব্যেন্দু পুরী যাওয়া ছেড়ে দিলেও বাবাকে ফাঁকি দিতে পারল না। পরিতোষবাবুর কানে নানারকম গুজব অনেকদিন

থেকেই আসছিল। এবার নিজেই তার ফয়সালা করবার জন্যে হঠাৎ তিনি একদিন পুরীর ট্রেনে চেপে বসলেন। দিন-দুই পরেই ফিরে এলেন, যা করবেন তা একেবারে হাতের মুঠোয় করে। গিন্নীকে ডেকে বললেন, 'তোমার ছেলেকে বলে দাও আমি অঘ্রান মাসের প্রথম লগ্নে ওর বিয়ের ব্যবস্থা করছি।'

যে কথা সেই কাজ। ঘটক-ঘটকীদের মেলা বসে গেল বাড়িতে। শাস্ত্রজ্ঞরা অঘ্রান মাসে অগ্রপুত্রের বিবাহে আপত্তি তুলেও কিছু করতে পারলেন না। পাকাদেখা, গায়ে-হলুদ, বিয়ে, বৌভাত সবকিছুর দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেল। শুধু পাত্রী পছন্দ করার যা অপেক্ষা।

একমাত্র ছেলের বিয়ে দেবার আনন্দে নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেলেন দিব্যেন্দুর মা। ঝেঁটিয়ে মেয়ে দেখলেন। পছন্দও করলেন কয়েকটিকে। কিন্তু পণ্ডিতমশাই পছন্দ-অপছন্দের ধার ধারেন না। গ্রহনক্ষত্রের নিশ্চিত পদক্ষেপের ওপর যেখানে পাত্রপাত্রীর আস্ত জীবন নির্ভর করছে সেখানে তাঁর হাত-পা বাঁধা। কুঞ্চিত ললাটে রূপোর চশমা তুলে তিনি একে একে তাই ভাল ভাল সম্বন্ধগুলোকে বাতিল করে দিতে লাগলেন।

দিব্যেন্দুর মা হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। এমন সময় পরিতোষবাবু একদিন রাত্তিরে খেতে খেতে সুখবর জানালেন যে দুটি পাত্রী ঠিকুজি-পরীক্ষায় পাশ করেছে। বললেন, 'একটি তো আমাদের জানা ঘর। কুঞ্জবিহারী বসু নামকরা সবজজ ছিলেন। তাঁর ছেলে বিভূতিকেও আমি চিনি।—কুঞ্জবাবুর মেয়েকে যদি তোমার পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে তো কোন কথাই নেই।'

পরিতোষবাবুর মতের এধার ওধার হল না। পাকা কথা দিয়ে দিলেন ভাবী বেয়ানকে।

বিরূপ কিন্তু মায়ার সঙ্গে দিব্যেন্দুর বিয়ের খবর জানতে পারেনি।

যে রাত্রে নমিতার কলকাতা যাওয়া সাব্যস্ত হয় বিরূপ বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ জেগে ছিল। ভাল করে ভেবেছিল সব দিক। তার মনে হয়েছিল—ধরা যাক দময়ন্তীদেবী মঙ্গলামামীর অনুমতি না নিয়েই নমিতাকে রাতারাতি কলকাতা নিয়ে গেলেন শুধু তার হারান স্বামী পাইয়ে দেবেন বলে— তাতেই বা কী এল-গেল? আবার নমিতাকে নিয়ে তিনি যদি বিষ্ণুপুরেই ফিরে আসেন, তখনই বা কী প্রমাণ হবে?

বিরূপ শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখল বিষ্ণুপুর ছেড়ে যাওয়া ছাড়া তার অন্য গতি নেই। দময়ন্তীদেবী যখন নমিতার ভার নিয়েছেন তখন তার করবারও কিছু নেই। নমিতারা ফেরবার আগেই সে তাই বিষ্ণুপুর ছেড়ে যাবে ঠিক করল।

যাবার আগে বিরূপ মহেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে চাকরির ইস্তফাপত্র দিয়ে গেল। কিন্তু তার কলকাতার ঠিকানা ছাড়া আর কোন ঠিকানা দিয়ে যেতে পারলনা।

মায়ার বিয়ে পাকাপাকি হয়ে যেতে বিভূতি যখন বিরূপকে চিঠি লিখল, তার আগেই বিরূপ বিষ্ণুপুর ছেড়ে চলে গেছে। চিঠিখানা কলকাতায় ফিরে যেতে বিভূতি ব্যস্ত হয়ে টেলিগ্রাম করল কলেজের অধ্যক্ষকে। মহেশ্বরবাবু দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে বিরূপ বিষ্ণুপুর থেকে কোথায় গেছে তা কাউকে বলে যায়নি।

পঁচিশ

দময়ন্তীদেবীর অভিভাবকত্বে নমিতার যেন নবজীবন শুরু হল। নমিতার ধারণা ছিল না যে জীবনে এত জানবার আছে, শেখবার আছে, দেখবার আছে, শোনবার আছে। তার লজ্জা হতে লাগল যে একদিন তার গর্ব হয়েছিল ম্যাট্রিক পাশ করে। লেখাপড়া মানে যে লিখতে আর পড়তে শেখা নয় এতদিনে সে বুঝতে পারল। দময়ন্তীদেবী দেখিয়ে দিলেন, সত্যিকারের লেখাপড়া মানে এমনই এক একটি জ্ঞানের বীজ আহরণ করা যা থেকে নতুন নতুন জ্ঞানবৃক্ষ জন্মায়, বড় হয়, শাখাপত্রফলফুলে ভরে ওঠে।

শুধু লেখাপড়া নয়, নমিতা গান ছেড়ে দিয়ে যতখানি পেছিয়ে পড়েছিল তাও দ্বিগুণ পরিশ্রমে পুষিয়ে নিতে দময়ন্তীদেবী তাকে বাধ্য করালেন। তা ছাড়া অবসরের ফাঁকে ফাঁকে নানান কাজ দিয়ে ভরিয়ে দিতে লাগলেন তার চিন্তার ছিদ্রগুলো।

দময়ন্তীদেবীর খুব পছন্দ হয়েছিল নমিতাকে। ভাল লাগত তার চেষ্টা, ধৈর্য, অনুশীলন, নম্রতা। কিন্তু তাঁর ভাল লাগত না নমিতার অতিরিক্ত সঙ্কোচ, অকারণ লজ্জা, সর্বদা আদেশ পালন করার ইচ্ছা। তিনি বলতেন, 'তুমি খুব ভাল এ্যাসিস্টেন্ট তৈরী হয়েছ। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম তোমার ওপর অনেকগুলো ভার চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হতে। তা হলে হয়ত শান্তিতে মরতে পারতাম।'

নমিতা চমকে উঠে অভিযোগ করেছিল, 'ও রকম কথা বললে আমি আপনার এখানে থাকব না।'

দময়ন্তীদেবী নমিতার দিকে করুণার দৃষ্টিতে না তাকিয়ে পারেন নি।

এক এক সময় দময়ন্তীদেবীর সত্যিই দুর্ভাবনা হত নমিতার জন্যে। ভাবতেন হঠাৎ যদি তাঁকে ইহজগত থেকে বিদায় নিতে হয়, তাহলে নমিতা কী করবে? সে কী আবার মঙ্গলামামীর আশ্রয়ে ফিরে যাবে? দুবেলা দুমুঠো ভাতের জন্যে সর্বস্ব বিকিয়ে দেবে একে একে?

স্বামীর সঙ্গে দময়ন্তীদেবীর মাঝে মাঝে আলোচনা হত নমিতাকে নিয়ে। একদিন দময়ন্তীদেবী কথায় কথায় বললেন, 'নমিতার শেখবার চাড় আছে কিন্তু শিক্ষাকে কাজে লাগাবার চাড় নেই। তাই ভাবছিলাম ওকে কোন স্কুলের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলে কেমন হয়। তাহলে হয়ত ওর মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নেশা জাগতে পারে, নিজেকে খানিকটা ও ফুটিয়ে তুলতে পারে।'

প্রতুলবাবু বললেন, 'সে আর শক্ত কী? বদরিপ্রসাদবাবুকে বললেই তো হয়ে যায়।'

—'তা জানি। কিন্তু ও রকম স্কুলের কথা আমি ভাবিনি। আমি ভাবছিলাম মেয়েদের একটা আদর্শ স্কুল যদি খোলা যেত।'

—'এই ছাখো!' প্রতুলবাবু রসিকতা করে চোখ কপালে তুললেন।—'আমি কোথায় মনে করছিলাম যে আদর্শ কলেজ খোলার ধাক্কাটা সামলে কয়েকটা দিন শান্তিতে কাটাব, আর অমনি তুমি আদর্শ স্কুল খোলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লে!'

দময়ন্তীদেবী লজ্জা পেয়ে বললেন, 'ব্যস্ত হব কেন? মাথায় এল তাই বললাম।'

প্রতুলবাবু অভিমানের ভান করে বললেন, 'বেশ! বল তো ঘাটশীলার বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে আদর্শ স্কুলের টাকা যোগাড় করি।'

প্রতুলবাবু জানতেন কথাটার কী প্রতিক্রিয়া হবে। স্ত্রীর দিকে ইচ্ছে করেই তাকালেন না সেই জন্যে। দময়ন্তীদেবী সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলেন। যেতে যেতে বললেন, 'ঐ বাড়িটাই তো তোমার দন্তশূল হয়েছে!'

ঘাটশীলার বাড়ি বিক্রি করার কথাটা নিছক ঠাট্টা হলেও আদর্শ স্কুল প্রতিষ্ঠা করবার পরিকল্পনাটা প্রতুলবাবু মনের চেঁদাবাক্সে টুপ করে ফেলে দিলেন।

দময়ন্তীদেবী ভুলে গেলেন কী বলেছিলেন, কিন্তু প্রতুলবাবুর চিন্তার বিরাম রইল না। নানা জল্পনাকল্পনা করলেন মনে মনে, লুকিয়ে লুকিয়ে হিসেব কষলেন, প্ল্যান আঁকলেন। তারপর হঠাৎ একদিন স্ত্রীকে বললেন, 'ছাখো, অনেক পার্টিই তো আমরা দিই, অনেক মহাপুরুষের স্মৃতিবাসরও সাজিয়ে থাকি, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাইয়ের নাম করে তো কখন এক কুনকে মুড়িও ভাগ করে খাইনি পাঁচজনে মিলে?'

দময়ন্তীদেবীর আঁতে ঘা লাগল। বললেন, 'তোমার কাছে কোনটা আসল কোনটা নকল তা বোঝবার তো উপায় নেই! মুড়ি খেতে চাও না বিদ্যাসাগর মশাইকে শ্রদ্ধা জানাতে চাও সেইটেই স্পষ্ট করে বল।'

প্রতুলবাবু হাসলেন, কিন্তু মনের কথা ভাঙ্গলেন না। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের জন্ম-তারিখটা আগেই দেখে রেখেছিলেন—তবু নতুন করে দেখবার ছুতো করে দু-একটা বই নাড়াচাড়া করলেন। —'এ্যাঃ—কী রকম যোগাযোগ দেখ। সামনেই বিদ্যাসাগর মশাইয়ের জন্মতিথি—বারই আশ্বিন। সেই দিনই একটা পার্টি লাগিয়ে দেওয়া যাক—কী বল?'

দময়ন্তীদেবী তো আপত্তি করলেনই না, বরঞ্চ মনে মনে ঠিক করলেন যে আগের সব পার্টির চেয়ে জাঁকিয়ে করবেন এই পার্টি—যাতে মহাপুরুষের আত্মা ভুলে যান যে তাঁকে এ বাড়িতে আগে কোনদিন সভা করে স্মরণ করা হয়নি।

বাস্তবিক সম্ভ্রান্ত অতিথিদের মধ্যে সকলেই প্রশংসা করলেন দময়ন্তীদেবী ও প্রতুলবাবুর কর্তব্যবুদ্ধির।

প্রতুলবাবু বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'আমরা হলাম বিদ্যার ব্যাপারী। জাহাজের খবর না রাখলেও সাগরসৈকতে আমাদের যেতে হয় নুড়ি কুড়োবার জন্যে। কাজেই বিদ্যাসাগর মশাইকে স্মরণ করার মধ্যে অন্ততঃ আমার কোন বাহাদুরি নেই।'

যথাসময়ে সভা শুরু হল। অভ্যাগতদের মধ্যে দু-একজন বক্তৃতা দিলেন। তারপর চায়ের পেয়ালা আর খাবারের রেকাব হাতে করে আলাপ-আলোচনা হল কিছুক্ষণ।

প্রতুলবাবু সুযোগের অপেক্ষায় বসেছিলেন। নারীশিক্ষা প্রচলনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দানের কথা উঠতে তিনি বললেন, 'আমাদের মত গরিব দেশে শিক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিলাসিতা, কিন্তু হওয়া উচিত জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। নারীশিক্ষা আরও বেশী দরকার কারণ অনেকক্ষেত্রে পুরুষ শিক্ষার অভাব শ্রম দিয়ে পূর্ণ করতে পারে, মেয়েদের দ্বারা সব সময়ে তা সম্ভব হয় না। আমার স্ত্রীর তাই একটা পরিকল্পনা আছে যে কখনও সুবিধে হলে তিনি এমন এক আদর্শ বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবেন যেখানে নামমাত্র বেতনে অথবা বিনা-বেতনে মেয়েদের সর্ববিষয়ে শিক্ষাদান করার ব্যবস্থা থাকবে।—সে ব্যবস্থা শুধু পরীক্ষায় পাস করার জন্যে নয়, তার উদ্দেশ্য হবে প্রত্যেক মেয়েকে বুঝিয়ে দেওয়া যে তার নিজের উন্নতি করা, নিজেকে স্বাবলম্বিনী করা তার নিজের হাতে। এও বুঝিয়ে দেওয়া হবে যে সুপারিশের বা বংশগত অধিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না ঝুঁকে প্রত্যেকে যদি সম্মুখযুদ্ধে গুণের

এমনকি রূপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে শেখে তখনই তারা সাধনার মর্ম বুঝবে এবং পরিশ্রম ও চেষ্টার দ্বারা এমন গুণ বা রূপ অর্জন করতে পারবে যা কৃত্রিম নয়, ক্ষণস্থায়ী নয়—যার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেবার জন্যে পরের খোশামোদ করার দরকার হবে না—প্রপ্যাগাণ্ডার দরকার হবে না।'

প্রতুলবাবুর কথা শেষ হতে 'হিয়ার—হিয়ার' ধ্বনিতে ঘরখানা ভরে গেল।

আসরের সভাপতি ছিলেন অনাদি চক্রবর্তী। বিষ্ণুপুরের দুঁদে উকিল। বহুদর্শিতার সুনাম বদনাম দুটোই গয়লার বাঁকের মত ঘাড়ে করে বেড়ান তিনি। প্রতুলবাবুর ভাষণের একটা সমালোচনা করবার জন্যে তিনি গলাখাঁকারি দিলেন। বললেন, 'দেখুন, আধুনিক মতে যুগ হল একটাই, অর্থাৎ বর্তমান। অতীত আর ভবিষ্যৎকে টেনে আনা শুধু বর্তমানকে বাঁচাবার জন্যে। আমরা উকিল, তাই এ তত্ত্বটা ভাল বুঝি। যে কেসটা কোর্টে ওঠে সেইটেই আমাদের কাছে বর্তমান — তা জেতবার জন্যে প্রিসিডেন্স-এর নজিরও বার করি, ভবিষ্যতের ধর্মভয়ও দেখাই। তাছাড়া বার বার এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে আপনি-আমি এইটেই ঠেকে শিখেছি যে মানুষের জীবন পদ্মপত্রে নীর, অতএব বর্তমানের সঙ্গে তাল রেখে চল—কীর্তি রেখে যাবার চেষ্টা কোর না।'

সত্যেন বললে, 'তাহলে কি আপনি বলতে চান যে দময়ন্তীদেবীর পরিকল্পনাটা শুধু কীর্তি রেখে যাবার একটা অছিলা?'

—'ঠিক তা নয়। আমি বলছিলাম যে দময়ন্তীদেবীর পরিকল্পনাকে কাজে দাঁড় করাতে গেলে যে পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ ও উত্তেজনার দরকার হবে তার ফল দেখার আনন্দ পেতে হলে ওঁকে অনেক বছর অপেক্ষা করতে হবে। এখনকার যুগের মানুষ এ রকম ঝামেলায় যেতে চান না। তাঁরা বলেন সরকারের আয়ু অনন্ত। তিনি আজ বীজ রোপণ করে পঞ্চাশ বছর পরে ফল

ভক্ষণ করুন—আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমি কেন অত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাই? ক-এক ঘণ্টার উত্তেজনা উপভোগ করতে বলুন আমি রাজী আছি—সিনেমা, থিয়েটার, নাচ, জলসা—হ্যাঁ। তাবলে যদি বলেন এক টাকা চাঁদা দিয়ে দময়ন্তীদেবীর স্কুলপ্রতিষ্ঠার সাহায্য করতে—আমার সময় কোথায় অপেক্ষা করবার? কবে স্কুল দাঁড়াবে তার আনন্দে টাকাটা এখনই হাতছাড়া করি কেন?'

মিষ্টার দাশ বলে উঠলেন, 'আমি মনে করিনা যে দময়ন্তীদেবী এ শুভ কাজে নামলে তাঁকে টাকার ভাবনা ভাবতে হবে।'

—'না-না। আমি তা বলছি না। আমার কথাটা আপনারা বুঝতেই পারেন নি। আমি কুইক রিটার্নের কথা বলছিলাম। শুভকাজের ফল দেরিতে ফললেও তার ওপর অশুভ দৃষ্টি পড়ে। তাই আমার মতে দময়ন্তীদেবী এ কাজে হাত দেবার আগে আর একটা কাজ করতে পারেন যার মধ্যে উত্তেজনা অনেক বেশী, অপেক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা কম। —তার ওপর রাতারাতি নাম করার সুযোগ তো আছেই।'

মিসেস হালদার এবার কথা না বলে থাকতে পারলেন না। বললেন, 'অনাদিবাবু এমন ক্ষেপে ক্ষেপে তাঁর বক্তব্যটা বলবার চেষ্টা করছেন যেন একসঙ্গে বলে ফেললে একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটে যেতে পারে।'

অনাদিবাবু হেসে বললেন, 'মাপ করবেন। আমি যে প্রস্তাবটা জানাতে চাই তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হঠাৎ বলে ফেললে দময়ন্তীদেবী হয়ত উড়িয়েই দিতেন। তাই আমি আপনাদের খানিকটা সময় নষ্ট করলাম। কিন্তু আমি অনেক ভেবেচিন্তেই আজ প্রস্তাবটা জানাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছি—আমার বিশ্বাস আপনারা সকলেই একবাক্যে সমর্থন করবেন। —আমার প্রস্তাব হল এই যে আমাদের এলাকায় বিধানসভার সদস্যের যে পদ খালি

হয়েছে তা দখল করার জন্যে দময়ন্তীদেবী নির্বাচন যুদ্ধে নেমে পড়ুন। ওঁর চেয়ে যোগ্য হাতে আমাদের দায়িত্ব তুলে দেবার কথা আমরা ভাবতেও পারি না। অবশ্য এ সব ব্যাপারে রেষারেষি হয়েই থাকে। তবে এ সামান্য যুদ্ধ জয় করা দময়ন্তীদেবীর পক্ষে মোটেই কষ্টকর হবে না। তাছাড়া আমি এও মনে করি যে দময়ন্তীদেবী যদি আমাদের অনুরোধ রাখতে রাজী হন তাহলে অনেক বড় বড় কাজ করবার সুযোগ তিনি পাবেন এবং তখন বিষ্ণুপুরের মেয়েদেব জন্যে একটা কেন দশটা আদর্শ স্কুল তিনি যখন তখন খুলতে পারবেন।'

সকলের মুখ একই সঙ্গে দময়ন্তীদেবীর দিকে ফিরল। তিনি মাথা নীচু করে মুচকি হাসলেন।

পীড়াপীড়ি শুরু হয়ে গেল। অনাদিবাবু যে কথার মত কথা বলেছেন তাতে সন্দেহ ছিল না কারুর।

কিছুক্ষণ পরে দময়ন্তীদেবী বললেন, 'আমি সত্যিই দুঃখিত যে আপনাদের অনুরোধ রাখবার জন্যে আমায় এতবার করে বলতে হচ্ছে। কিন্তু আমি জানি, এতবড় দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা আমার নেই।'

দময়ন্তীদেবী বললেন না রাজনৈতিক খ্যাতিকে তিনি বরাবর ভীতির চোখে দেখে এসেছেন।

অনাদিবাবু এবং অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে অনেকেই যাবার সময় দময়ন্তীদেবীকে বলে গেলেন কথাটা ভাল করে ভেবে দেখতে।

কিছুদিন পরে একদিন সকালে অনাদিবাবু আবার এলেন নিজে থেকেই। দময়ন্তীদেবী হেসে বললেন, 'আমি ইলেকশানএ জিতলে আপনার কী লাভ বলুন তো?'

অনাদিবাবু বললেন, 'লাভ আমার একার নয়—লাভ সমষ্টির। তাছাড়া ধর্মদাস সাহা সারাজীবন অধর্ম করে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবে এও আমরা চোখে দেখতে পারব না।'

'তাহলে আর কাউকে শিখণ্ডী করে আপনারা যুদ্ধ করুন—আমাকে এর মধ্যে টানছেন কেন?'

অনাদিবাবু শুনলেন না। বেলা দুপুর অবধি ওকালতি করে শেষ অবধি দময়ন্তীদেবীর মুখ থেকে কথা নিয়ে গেলেন যে তিনি রণরঙ্গিনী হয়ে নির্বাচন যুদ্ধে অবতরণ করবেন। দময়ন্তীদেবী অনাদিবাবুর যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন শুধু এই ভেবে যে এ যুদ্ধ শুধু ধর্মদাস সাহার বিরুদ্ধে নয়, এ যুদ্ধ ধরতে গেলে অধর্মের বিরুদ্ধে—যিনি অধর্মের দাস তাঁরই বিরুদ্ধে।

কিন্তু দময়ন্তীদেবী জানতেন না যে এ যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ হবে না। তিনি এও জানতেন না যে অনাদিবাবু এবং অন্যান্য হিতৈষীরা তাঁর ড্রয়িংরুমে বসে যখন অটল বিশ্বাসে নিশ্চিত ভোটফল গণনা করবেন, তখন ধর্মদাস সাহা এই বলে ভোটসংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করবেন যে কলিযুগে কলি নলের পরিবর্তে দময়ন্তীর দেহে প্রবেশ করেছেন এবং তারই ফলে—।

শ্রোতাদের দোষ কী? কেচ্ছা শোনার ইচ্ছে কার না হয়? 'বলুন—বলুন' শব্দে বক্তাকে উৎসাহ দেন তাঁরা।

ধর্মদাস সাহা বলেন যে পরনিন্দা পরচর্চা করা তাঁর স্বভাব নয়, কিন্তু তিনি মনে করেন যে দময়ন্তীদেবীর মত সম্ভ্রান্ত মহিলা যখন লোকসমাজকে থোড়াই কেয়ার করে যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছেন তখন বুঝতে হবে তিনি নিজের ইচ্ছেতে কিছু করছেন না, কলি তাঁর ওপর ভর করে যা করাচ্ছেন তিনি তা করতে বাধ্য হচ্ছেন। শ্রোতাদের হাসির রোলে বক্তার কণ্ঠ চাপা পড়ে যেতে 'থামুন—থামুন' বলে তিনি আবার বক্তৃতা শুরু করেন। বলেন যে কৃতযুগে পতিব্রতা দময়ন্তী স্বামী-পরিত্যক্তা হয়েও প্রাতঃস্মরণীয়া,

কিন্তু কলিযুগে দময়ন্তীদেবীর ভ্রাতৃবধূ পতিব্রতা না হয়ে স্বামী-পরিত্যক্তা হয়েছেন বলে দময়ন্তীদেবী তাঁকে মাথায় করে নাচছেন। এরপরও কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে যে দময়ন্তীদেবীর দেহে কলি প্রবেশ করেন নি ?

বলাবাহুল্য, ধর্মদাস সাহার বক্তিমা শুনে শ্রোতাদের ভক্তি তাঁর ওপরই বেড়ে যায়, এবং নির্বাচনের পরদিন জানা যায় যে তিনি দময়ন্তীদেবীকে হাস্যকর ভাবে পরাজিত করে বিধানসভার শূন্য আসন পূর্ণ করার অধিকার পেয়েছেন।

ছাব্বিশ

এতবড় আঘাত জীবনে পাবেন, দময়ন্তীদেবী আশা করেন নি। বিষ্ণুপুরের জনসাধারণ কি দময়ন্তীদেবীকে চিনতেন না যে ধর্মদাস সাহা যা বলল তাই তাঁরা মেনে নিলেন ? কে চিনত ধর্মদাস সাহাকে এর আগে ? সে যে দময়ন্তীদেবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করেছিল এই তার যথেষ্ট বাহাদুরি। তার জমানত বাজেয়াপ্ত হলেও অবাক হবার কিছু ছিল না।

দময়ন্তীদেবী ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁকে আরও অসহ্য করে তুলল অনাদিবাবু আর হিতৈষীদের সহানুভূতি। সবাই মিলে তাঁকে অপদস্থ করে আবার যেন এসেছেন সমবেদনা জানাতে। আলাদিনের বৌয়ের মত তাঁকে বোকা বানিয়ে এখন মনে মনে

হাঁসছেন তাঁরা। এত সম্মান, এত শক্তি, এত প্রতিপত্তি তাঁরাই কেড়ে নিয়ে গেছেন রাতারাতি।

দময়ন্তীদেবী মুখ বুজে রইলেন। শুনে গেলেন যে যা বলল। রাগলেন না, তর্ক করলেন না, এমন কি লুকিয়ে লুকিয়ে এক ফোঁটা চোখের জলও ফেললেন না। তার ফল ভাল হল না। কয়েকদিন যেতে না যেতেই তাঁকে হিষ্টিরিয়া রোগে ধরল—তাঁর ঘন ঘন ফিট হতে লাগল। ধর্মদাস সাহার মিথ্যাবচন যেন ফলে গেল—কলি বুঝি সত্যি সত্যি তাঁকে ভর করলেন।

স্ত্রীর অবস্থা দেখে প্রতুলবাবু ভয় পেয়ে গেলেন। ডক্টর নাগ ফলাও চিকিৎসা না করে সোজাসুজি বললেন, 'লম্বাছুটি নিয়ে স্বামীস্ত্রীতে বেরিয়ে পড়ুন। ওঁর দরকার দুটো জিনিস—রেষ্ট আর চেঞ্জ। ওষুধপত্তরে কিছু হবে না।'

প্রতুলবাবু ভাবলেন—সত্যিই তো! স্বামীস্ত্রীতে ভবঘুরের মত বেড়াতে বেরোননি আজ কত বচ্ছর? তাঁর নিজেরও বিশ্রাম নেবার দরকার। মস্তিষ্কের কারখানায় লোক লাগে না বলে তিনি বিরাম দেননি কারখানাকে—তারও তো ছুটি পাওনা হয়েছে! দুবার না ভেবে প্রতুলবাবু এক শুভদিন দেখে স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

নমিতাকে প্রতুলবাবু সঙ্গে নিলেন না। বাড়ি আগলাবার নাম করে বিষ্ণুপুরেই রেখে গেলেন।

নমিতা কিছু বলল না। হিষ্টিরিয়া রোগে ভুগে দিদি বদলে যাচ্ছেন সে লক্ষ করেছিল। কারণে অকারণে তিনি চটে যেতেন নমিতার উপর। নমিতা মুখ বুজে থাকত। রোগকেই দায়ী করত দিদির অন্যায় তিরস্কারের জন্যে। তবু থেকে থেকে তার মনে হত যেন তার ভাতের থালা নড়ে উঠছে—এ বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে।

এমনিতেই নমিতার মনের কথা বলবার কোন লোক ছিল না বিষ্ণুপুরে। প্রতুলবাবু আর দময়ন্তীদেবী চলে যেতে সে আরও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। সারাদিন বাড়িটা দৈত্যপুরীর মত খাঁ খাঁ করে—একা একা সময় যেন কাটতেই চায় না।

মাঝে মাঝে মিত্র-পরিবারের কোন বন্ধুবান্ধবী এসে পড়লে নমিতা যেন বর্তে যেত। কী করে যে তাদের আদর-আপ্যায়িত করে পাঁচ মিনিট আটকে রাখবে তা ভেবে কুলকিনারা পেত না। কিন্তু নমিতার আতিথ্য বড় একটা কেউ স্বীকার করতেন না। দময়ন্তীদেবী আর প্রতুলবাবুর খোঁজ নিয়েই সকলে চলে যেতেন—নমিতার গায়ে পড়া আন্তরিকতাকে আমলই দিতেন না।

মাসের পর মাস এই ভাবে কেটে যেতে নমিতা ক্রমশঃ অধৈর্য হয়ে উঠতে লাগল। একদিন সে কেঁদেই ফেলল বাইরের বারান্দার চেয়ারে একা একা বসে।

এমন সময় সত্যেন এল তার গাড়িতে। সত্যেন মাঝে মাঝে এসে জেনে যেত দময়ন্তীদেবী এখন কেমন আছেন, কোথায় আছেন, কবে ফিরবেন। দাঁড়াত না। আজ কী মনে করে একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে—ঘরে আলো নেই— বারান্দাটা অন্ধকার। চারিদিকে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। নমিতা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়াল। হাসবার চেষ্টা করল। হাতজোড় করে নমস্কার জানাল। দময়ন্তীদেবীর নকল করে সত্যেনকে জিজ্ঞেস করল, 'চা না কফি?' সত্যেন ভেবে বলল, 'কফি।' নমিতা ভেতরে চলে গেল। বুড়ি ঝিকে বলল বারান্দায় আলো দিয়ে আসতে। রান্নাঘরে গিয়ে সত্যেনের জন্যে কফি তৈরি করতে লাগল।

সত্যেন বুঝতে পেরেছিল নমিতার চোখ মোছা। দুঃখও পেয়েছিল তার জন্যে। নমিতা কফির পেয়ালাটা বেয়ারাকে দিয়ে

পাঠিয়ে দিয়েছিল। সত্যেন ছোঁয়নি। অপেক্ষা করছিল নমিতার জন্যে। জুড়িয়ে যাচ্ছিল কফিটা। নমিতা এসেই বললে, 'ওমা, কফিটা যে আপনার। ঠাণ্ডা করে ফেললেন ?'

—'আপনার কই ?'

—'আমি কফি খাই না। এমনিতেই—।' কী বলতে গিয়ে নমিতা থেমে গেল।

সত্যেন কফির পেয়ালাটা তুলে নিল।

নমিতাকে নিয়ে বিষ্ণুপুরে যে রকম ঢি ঢি পড়ে গেছে তাতে তার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় বসে গল্প করাটা সত্যেনের পক্ষে নিরাপদ নয়। তেমন লোকের চোখে পড়লে তার নামেও কথা উঠে যাবে কাল। তবু সত্যেনের মন বলল, এ অন্যায়। হাকিম হয়ে তার অন্ততঃ দেখা উচিত যে বিনা দোষে কেউ যেন শাস্তি না পায়।

কিছুক্ষণ ভেবে সত্যেন শেষকালে একটা দুঃসাহসের কাজ করে ফেলল। নমিতাকে নেমন্তন্ন করে ফেলল পরের রবিবার তার বাড়ির লনে ব্যাডমিনটন খেলতে যাবার জন্যে। ভয় নেই—নমিতাকে আশ্বস্ত করল সত্যেন—ক্লাব নয়, ঘরোয়া জটলা হয় ব্যাডমিনটন খেলার নাম করে।—'ঠিক আসবেন—কেমন ?' বলে সত্যেন উঠে পড়ল।

—'চেষ্টা করব।' নমিতা ইতস্তুতঃ করে বলল।

সত্যেন চলে যেতে নমিতার ভয় হতে লাগল। বিষ্ণুপুরে যে-সমাজে সত্যেন চলাফেরা করে তাদের নমিতা দেখেছে—তাদের সঙ্গে কথা বলতেও নমিতার ভয় করে।—অথচ একটু আগেই সে তো কথা না বলতে পেরে কেঁদে ফেলেছিল! মিস্টার সিনা কি তা বুঝতে পেরেছিলেন ?

নমিতা রবিবার বিকেল অবধি মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষকালে বেরিয়ে পড়ল।

সত্যেনের বাংলোর পেছনে লন। লনে ঢোকবার একটা স্বতন্ত্র গেট আছে—রাস্তা থেকেই সেটা দেখা যায়। নমিতা আড়ষ্ট হয়ে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। সত্যেন দূর থেকে নমিতাকে দেখতে পেয়ে র‍্যাকেট ফেলে ছুটে এল তাকে অভ্যর্থনা জানাতে। —'আসুন আসুন', বলে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল কোর্টে।

কোর্টের ভেতরে ও বাইরে মহিলা-পুরুষ মিলিয়ে সাত-আট জন উপস্থিত ছিলেন। সত্যেন অমন ভাবে খেলা বন্ধ করে চলে যেতে অসন্তুষ্ট হলেন কেউ কেউ। বললেন তাঁদের বাড়িতে কাজ আছে। লনের ওপর ছায়া না পড়তেই চলে গেলেন তাঁরা।

দু-একজন সোজাসুজি অসহযোগ না দেখালেও একটা সেট খেলার পরই পাততাড়ি গুটোলেন। শেষ পর্যন্ত নমিতার সঙ্গে খেলবার জন্যে আর কেউ রইলেন না মিস্টার হালদার ছাড়া।

সত্যেন দমল না। মিস্টার হালদারকে বলল, 'আসুন—সিঙ্গলস্‌ই খেলা যাক।'

নমিতা কবে ব্যাডমিনটন-র‍্যাকেট ধরেছিল ভুলে গেছে। এলেবেলে খেলার মত তার সঙ্গে পালা করে খেলতে হল সত্যেন আর মিস্টার হালদারকে।

নমিতা লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। মিস্টার হালদার বললেন, 'দু-চার দিন প্র্যাকটিস করলেই হাত খুলে যাবে—অনেকদিন খেলেননি নিশ্চয়।'

নমিতা হিসেব করে বললে, 'দশ বছর।'

সন্ধ্যার আগেই নমিতা চলে গেল। লনের ওপর বেতের চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে সত্যেন গল্প করতে লাগল মিস্টার হালদারের সঙ্গে। নমিতার কথাই হয়ে দাঁড়াল সেদিনকার আলোচ্য বিষয়। সত্যেন বললে, 'মিসেস চৌধুরী যাতে সহজভাবে পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে পারেন তার কী করা যায়?'

মিস্টার হালদার বললেন, 'একটু আগেই তো দেখলেন হাওয়া কোন দিকে বইছে।'

—'তা বলে আমাদের কি কোন কর্তব্য নেই?'

—'আমাদের না বলে আপনাদের বলুন। আপনার এ নিয়ে মাথা না ঘামানই ভাল—বিশেষ করে দময়ন্তীদেবী যখন এখানে নেই।'

সত্যেন বুঝতে পারল না মিষ্টার হালদার ঠাট্টা করছেন না হিতোপদেশ দিচ্ছেন। বললে, 'বেশ তো, আপনারাই মাথা ঘামান তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ভদ্রমহিলাকে অযথা এমন ভাবে একঘরে করে রাখাটা আমাদের সকলকার দিক থেকেই অত্যন্ত অন্যায় ও অভদ্রতা হচ্ছে। আর, আমি বলব যে দময়ন্তীদেবী এখন বিষ্ণুপুরে নেই বলে আমাদের অপরাধ আরও বেড়ে যাচ্ছে।'

মিস্টার হালদার বুঝলেন যে হাকিম সাহেব এবার সত্যি সত্যি ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করতে বসেছেন। তিনি তাই সুর বদলে ফেললেন সঙ্গে সঙ্গে। বললেন, 'আপনি যদি তাই ভাবেন তাহলে মিসেস চৌধুরীকে একঘরে করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এবার যেখানে পার্টি হবে আপনি বলে দেবেন যেন মিসেস চৌধুরীকে নেমন্তন্ন করা হয়। আসছে সপ্তাহেই তো সেন একটা মস্ত পার্টি দিচ্ছে তার বিলিতী সায়েবের অনারে। সায়েব ফার্লো নিয়ে বিলেত গিয়েই সেনকে বম্বাই বদলি করে দেবে ওখানকার চীফ সেলস্-ম্যানেজার করে। সেনকে আমিই না হয় বলে দেব আপনার নাম করে।'

মিষ্টার হালদারের কথায় সত্যেনের মন অনেকখানি হালকা হয়ে গেল। কারণ নমিতার ওপর অবিচারের কথা বাদ দিলেও বিরূপ বিষ্ণুপুর ছেড়ে যাবার সময় সত্যেনকে বলে গিয়েছিল নমিতার ভালমন্দর দিকে একটু দৃষ্টি রাখতে।

বিরূপের ঠিকানাও বিষ্ণুপুরে শুধু সত্যেনই জানত। চিঠিপত্রের আদানপ্রদানও হত তাদের দুজনের মধ্যে।

বিরূপ প্রায় প্রত্যেক চিঠিতে লিখত নমিতার কথা—জানতে চাইত দময়ন্তীদেবী তার কতখানি ক্ষতিপূরণ করতে সমর্থ হয়েছেন। সত্যেন একবার তার উত্তরে লিখল—'মিসেস চৌধুরীর স্বামী ছাড়া তাঁর ক্ষতিপূরণ আর কেউ করতে পারবে না। তবে যদি তিনি নিজেকে বিষ্ণুপুরের সমাজে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন আমি বলব তাঁর পুনর্জন্ম হল। এর চেয়ে বেশী আশা করা অন্যায়। তাঁর আগের জীবনের সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ তুলনা করতে যাওয়া বোকামি।'

বিরূপ প্রশ্ন করল, 'তাহলেই কি আমার সব দায়িত্ব মিটে গেল? আমার প্রায়শ্চিত্ত করার কোন দরকারও রইল না, অধিকারও না?'

সত্যেন লিখল, 'আগে বল ভদ্রমহিলার দুর্ভাগ্যের তুমি উপলক্ষ্য না কারণ? যদি কারণ হও, সব দায়িত্ব তোমার। আর উপলক্ষ্য হলে তোমার দায়িত্বের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে যদি তুমি গায়ে পড়ে তাঁর উপকার করতে চাও তার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। ফল যাই হোক তুমিই কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

সাতাশ

রবিবার ব্যাডমিনটন খেলা সাঙ্গ হবার পর অনেকগুলো বেতের চেয়ার জড় হয়ে আড্ডা জমেছিল সত্যেনের লনে। নমিতাও বসেছিল একধারে। সেনের পার্টিতে তার গান গাওয়ার সুখ্যাতিই হচ্ছিল। নমিতা আসর মাত করেছিল বলে সত্যেনের আনন্দ যেন ধরছিল না। বলতে গেলে নমিতা অসাধ্যসাধন করে ফেলেছে। অনেকের উঁচু নাক নীচু করে রাতারাতি জাতে উঠে গেছে।

এমন সময় মিষ্টার প্যাটেল এলেন। প্রৌঢ় গুজরাটি। সেনের পার্টিতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জানিয়েছিলেন তিনি নমিতাকে। অনেকে তাই মিষ্টার প্যাটেলকে ভাতিয়ে দিয়ে মজা দেখবেন ভাবলেন।

মিষ্টার দাশ বললেন, 'কী বলুন প্যাটেল সাহেব, একথা আপনিও নিশ্চয় মানেন যে প্রকৃত গুণীলোকের একটা বিশেষ ক্ষমতা থাকে অচেনা গুণীকে খুঁজে বার করবার। ধুলোকাদা মাখা থাকলেও রত্নকে তাঁরা দূর থেকেই চিনে ফেলেন।'

—'কার কথা বলছেন ?'

—'দময়ন্তীদেবীর। সেদিন সেনের পার্টিতে আমি মিসেস চৌধুরীর গান শুনে তত অবাক হয়নি ওঁর গুণের পরিচয় পেয়ে যত অবাক হয়েছিলাম এই ভেবে যে দময়ন্তীদেবী কী করে সকলের আগে ওঁকে আবিষ্কার করলেন।'

মিষ্টার প্যাটেল খুশি হলেন না মিষ্টার দাশের কথায়। বললেন, 'চুল চিরে বিচার বাঙালীরাই করেন। তাই তাঁরা খেলার মাঠে কে গোল দিল তা না দেখে বাহবা দেন যে বলটা

গোলের মুখে ঠেলে দিল তাকে—তেমনি সিনেমা দেখে সমালোচনা করেন পরিচালকের, যেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা হলেন এক একটা রং আর পরিচালকই হলেন আসল শিল্পী। এইজন্যে আপনাদের সঙ্গে অনেকের মতে মেলেনা। আমার তো নয়ই।'

সত্যেন বলল, 'আপনার মতে তাহলে কী কর্তব্য ?'

—'কর্তব্য অত্যন্ত সহজ। মেনে নেওয়া যে মিসেস চৌধুরীকে পেয়ে বিষ্ণুপুর এক দিক দিয়ে ধন্য হয়েছে এবং দময়ন্তীদেবীর পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি আদর্শ স্কুলই খুলতে হয়, তবে আগে আদর্শ সঙ্গীত-বিদ্যালয় খুলে মিসেস চৌধুরীর ওপর ভার দেওয়া উচিত বিষ্ণুপুরের মেয়েদের গান শেখাবার।'

মিষ্টার হালদার বললেন, 'কিন্তু দময়ন্তীদেবীর যে পরিকল্পনা তার মধ্যে সবরকম শিক্ষা একসঙ্গে দেবার কথাই ছিল। আপনি কি চান যে আলাদা আলাদা করে স্কুল খোলা হোক এক একটা শিক্ষার জন্যে ?'

মিষ্টার প্যাটেল ভারিক্কী গলায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বলতে থাকেন—স্কুল একটাই হোক আর দশটাই হোক তাতে কিছু যায় আসে না। তিনি মনে করেন, যে কোন একটা শিক্ষা পাকা করতে পারলে সব শিক্ষা তার থেকেই পাওয়া যায়। 'আপনারা হয়ত শুনে হাসবেন—।' বলে মিষ্টার প্যাটেল একবার থেমে আবার বলেন যে তিনি লেখাপড়া শেখেননি। আর একটা জিনিসই ছেলেবেলা থেকে শিখে এসেছেন—ব্যবসা করা। তার ভেতর থেকে তাঁকে অনেক কিছু শিখতে হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের সংস্পর্শে এসে নতুন নতুন জ্ঞান সঞ্চয় করতে হয়েছে। ভাল-খারাপ মিশিয়ে তাঁর জীবন পরিপূর্ণ হয়েছে—যেমন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শরীর পূর্ণ হয়। তাতে হয়ত অনেক খুঁতই থেকে গেছে—তা বলে খারাপ মনে করে কোন অঙ্গকে ফেলে দেবার প্রশ্ন তাঁর মনে কোনদিন জাগেনি।

সত্যেন বললে, 'তাহলে মূলকথাটা কী দাঁড়াল ?'

মিষ্টার প্যাটেল যা বললেন তার মানে দাঁড়াল এই যে দময়ন্তীদেবী বা আর কেউ যদি বিষ্ণুপুরের মেয়েদের জন্যে যথার্থ ভারতীয় সঙ্গীতশিক্ষার আদর্শ স্কুল খুলতে রাজী থাকেন এবং মিসেস চৌধুরী যদি গান শেখাবার ভার নেন তাহলে তিনি মোটারকমের টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

মিষ্টার প্যাটেলের বদান্যতা খাটো করে দিয়ে মিসেস হালদার বলে উঠলেন, 'দময়ন্তীদেবীর যে রকম শরীরের অবস্থা তাতে তিনি বা প্রতুলবাবু অদূর ভবিষ্যতে স্কুল খোলার ঝক্কি নিতে পারবেন বলে তো মনে হয় না।'

মিষ্টার প্যাটেলের প্রস্তাবটাকে অমন ভাবে ঠেলে ফেলে দেওয়া সত্যেনের ভাল লাগল না। সে বলে উঠল, 'যদি দময়ন্তীদেবী বা প্রতুলবাবু আপাততঃ এ কাজের দায়িত্ব নিতে না চান আমি আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুকে বলে দেখতে পারি।'

মিষ্টার প্যাটেল উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'বেশ তো—প্রতুলবাবুর মত নিঃস্বার্থ ও পরোপকারী কোন ভদ্রলোক যদি ভার নেন আমি কালই শুভকাজটা শুরু করে দিতে রাজী আছি।'

সত্যেনের পক্ষে এগিয়ে গিয়ে পেছিয়ে যাওয়া শক্ত হল। সে বললে, 'আমার বন্ধুটি এখন মুর্শিদাবাদে থাকেন। আপনি বলেন তো তাকে একটা টেলিগ্রাম করে দিই এখুনি চলে আসার জন্যে।'

মিষ্টার প্যাটেল হেসে বললেন, 'আপনি যখন রেকমেণ্ড করছেন তখন আমার আর বলবার কী থাকতে পারে ? কিন্তু যদি কিছু না মনে করেন তো জিজ্ঞেস করতে পারি কি, ভদ্রলোকের নাম কী—কী করেন তিনি ?'

সত্যেন থেমে থেমে বলল, 'ভদ্রলোক—প্রফেসার—অবিবাহিত—বয়স বেশী নয়, তবে তার চরিত্রের আমি জামিন—তাঁর নাম শ্রীবিরূপ বোস।'

নাম শুনে অনেকে আঁতকে উঠলেন, অন্ধকারেও তা বোঝা গেল। মিষ্টার প্যাটেল বুঝতে পারলেন না সিংহি সাহেব এতক্ষণ পরিহাস করছিলেন কি না। বললেন, 'স্কুলের ভার অবশ্য মিসেস চৌধুরীই নিতে পারেন, তবে দপ্তর চালান, বা বৈষয়িক কাজকর্ম দেখাশুনো করবার জন্যে সেক্রেটারি, বোর্ড এসব রাখতেই হবে। তাছাড়া স্কুলের গোড়াপত্তন করাও একটা কম হাঙ্গামার কাজ নয়। তার জন্যেও কয়েকজন কর্মিষ্ঠ ভদ্রলোকের দরকার।'

এত লোকের যেখানে দরকার সেখানে একা বিরূপ কী করবে, এই ভেবে যেন বিরূপের কথা কেউ আর উচ্চবাচ্য করলেন না। শেষ অবধি ভেবে দেখা গেল যে দময়ন্তীদেবী আর প্রতুলবাবু না আসা পর্যন্ত মিষ্টার প্যাটেলের প্রস্তাবটি মুলতবী রাখা ছাড়া উপায় নেই।

কথার মাঝখানে নমিতা একবার সত্যেনকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বিরূদা মুর্শিদাবাদে এ খবর এতদিন আপনি লুকিয়ে রেখেছিলেন কেন?' সত্যেন জবাব দিয়েছিল, 'বন্ধুর আদেশে।'

যাই হোক মিষ্টার প্যাটেলের মহানুভবতার কাহিনী চাপা রইল না। সারা বিষ্ণুপুরে তাই নিয়ে নানা রকম গুজব ছড়িয়ে পড়ল। সব চেয়ে অলৌকিক খবর শুনতে পাওয়া গেল যে মিষ্টার প্যাটেল নমিতা চৌধুরীর গান শুনে তাকে নাকি এক লাখ টাকার একখানা চেক লিখে দিয়েছেন। —এ সংবাদ শুনে চুপ করে বসে থাকা যায় না। প্রৌঢ় গুজরাটির দানের একটা মানে খুঁজতেই হয়। অথচ টাকার অংকটা এতই বড় যে নমিতা চৌধুরীকে ঠাট্টা করতেও সাহস হয় না কারুর। যার গানের দাম লাখ টাকা তার নাম শুনে মাথাটা অন্ততঃ একবার নোয়াতে ইচ্ছে করে।

আঠাশ

নমিতার লাখ টাকা পাবার গুজবে বিষ্ণুপুর যখন সরগরম, শোনা গেল দময়ন্তীদেবী ফিরে আসছেন।

অনেকেই চিঠি পেলেন। দময়ন্তীদেবী লিখেছেন তাঁর স্বাস্থ্য উন্নতির দিকেই যাচ্ছিল। কলকাতার বড় বড় দুজন ডাক্তার একমত হয়েছিলেন যে আর কয়েকমাস বিশ্রাম নিতে পারলে তাঁর রোগ একেবারে সেরে যেত। কিন্তু দময়ন্তীদেবী আর বিষ্ণুপুর ছেড়ে থাকতে পারছেন না। এ ক-মাস তিনি অনেক ধৈর্য দেখিয়েছেন। আহার-নিদ্রা-ভ্রমণ ছাড়া এমন কিছু করেন নি যাতে শরীরের বা মনের পরিশ্রম হয়—না রান্না, না সেলাই, না গানবাজনা। আর তিনি পারছেন না একঘেঁয়ে জীবন যাপন করতে। অগত্যা চিকিৎসকেরা তাঁকে বিষ্ণুপুরে ফিরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন তবে ছকে বেঁধে দিয়েছেন তাঁর খাওয়া, শোওয়া, চলাফেরা। আর বিশেষ করে বলে দিয়েছেন যে অন্ততঃ বছরখানেক তাঁর আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান চলবে না।

দময়ন্তীদেবী অবশ্য মনে মনে হেসেছিলেন। স্থির করেছিলেন যে বিষ্ণুপুরে গিয়ে ডাক্তারদের ভুল ভাঙাবার জন্যেও অন্ততঃ প্রমাণ করে দেবেন যে কর্ম শুধু নেশা নয়, একরকম খাদ্যও বটে। মানুষের মন আর সে খাদ্যের সঙ্গে ততখানিই ছিল যতখানি মিল শরীরের সঙ্গে ডালভাতের।

দিদি ফিরে আসছেন শুনে নমিতার মন নেচে উঠল। তার কত কী বলবার আছে। দেখাবার আছে। একদিন দময়ন্তীদেবী বলেছিলেন যে নমিতা তাঁর এ্যাসিস্টেণ্টই হতে পারবে, তাঁর আসনে বসবার যোগ্যতা নমিতার কোনদিনই হবে না। কিন্তু এবার ফিরে এসে তিনি নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবেন। বলবেন, 'আমার কথা ফিরিয়ে নিলুম। তুমি নিজেকে প্রকাশ করতে শিখেছ। বিনাস্বার্থে পরকে আপন করতে শিখেছ।' দেখা হতেই দময়ন্তীদেবী হয়ত জড়িয়ে ধরবেন নমিতাকে, কিংবা কেঁদেই ফেলবেন আনন্দের চোটে। তারপর ঘরে ঢুকবেন—ঘুরে ঘুরে দেখবেন নমিতা সারা বাড়িটা কত যত্নে রেখেছে—এক কণা ধুলো জমতে দেয়নি কোথাও। তখন সস্নেহে তাকাবেন নমিতার দিকে। বুঝবেন নমিতা ভোলেনি তাঁর উপদেশ—'চরম সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে পারাই ঈশ্বরকে পাওয়া।'

এই সব ভাবতে ভাবতে নমিতা দিন গুণছিল। শেষ চিঠিতে খবর এল দময়ন্তীদেবী আর প্রতুলবাবু কবে রওনা হচ্ছেন কলকাতা থেকে। নমিতা ঠিক করল তাঁদের আসবার দিন গেট থেকে বারান্দা অবধি ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে রাখবে। তাঁরা বাড়িতে পদার্পণ করতেই বাজাবে শাঁখ। তাঁদের শয়নকক্ষে পেতলের রেকাবের ওপর গোটান থাকবে দু-ছড়া যুঁইফুলের মালা। দিদি-জামাইবাবু দুজনেই আনন্দ পাবেন নমিতার সুন্দর রসিকতায়।

কিন্তু নমিতার এমনই দুর্ভাগ্য যে তার সব ব্যবস্থা পণ্ড করে দিয়ে দময়ন্তীদেবী আর প্রতুলবাবু বিষ্ণুপুরে ফিরলেন তিনদিন আগে, কোনও খবর না দিয়ে। তাঁরা বাড়ি পৌঁছলেন বেলা প্রায় চারটেয়। নমিতা শোবার ঘর বসবার ঘর চাবি দিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেছে বুড়ি ঝি বলতে পারল না।

নমিতা সত্যেনের সঙ্গে গিয়েছিল পুলিস গ্রাউণ্ডে স্পোর্টস দেখতে। মিষ্টার হালদারের বেয়ারা গিয়ে খবর দিল দময়ন্তীদেবী আর প্রতুলবাবু ফিরেছেন। শুনে দুজনেই হন্তদন্ত হয়ে চলে এল।

বাড়ি ঢুকে দেখল প্রতুলবাবু উঠোনে একটা কাঠের চৌকির ওপর বসে বালতির জলে স্নান করছেন। তিনি বললেন দময়ন্তীদেবী একটা স্যুটকেস নিয়ে মিসেস হালদারের ওখানে গেছেন। সত্যেন তাই শুনে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল দময়ন্তীদেবীকে আনতে। নমিতা লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি তালা দেওয়া ঘরগুলো খুলে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল।

কিছুক্ষণ পরেই সত্যেন দময়ন্তীদেবীকে নিয়ে ফিরে এল। নমিতা ছুটে গিয়ে 'কেমন আছেন?' বলে প্রণাম করবার জন্যে ঝুঁকেছিল। দময়ন্তীদেবী দাঁড়ালেন না। নমিতার দিকে চাইলেনও না। সোজা তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

নমিতা সত্যেনের সামনে অপদস্থ হয়ে মুখ নীচু করল। সাড়িতে জড়িয়ে যাওয়া দেহটাকে কোনমতে টেনে নিয়ে গেল সত্যেনের দৃষ্টির বাইরে। লুকিয়ে পড়ল রান্নাঘরে।

দময়ন্তীদেবীর ব্যবহারে সত্যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তার মনে হল দময়ন্তীদেবীর মুখে এতদিন একটা মুখোস ছিল যেটা তিনি বিদেশ থেকে ফেরবার সময় রাস্তায় কোথাও ফেলে এসেছেন। সত্যেন আর দাঁড়াল না। গম্ভীর হয়ে চলে গেল।

কিন্তু বাড়ি গিয়েও স্থির হতে পারল না সত্যেন। নমিতাকে স্পোর্টস দেখতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দময়ন্তীদেবী যদি কৈফিয়ত চাইতেন সে দিত কিন্তু কথা না বলে তিনি সত্যেনের চরিত্রের ওপর যেন কটাক্ষ করলেন। এ অপমান সত্যেন সহ্য করতে পারছিল না।

সন্ধ্যার পর সে আবার দময়ন্তীদেবীর বাড়ি গেল।

ড্রয়িংরুমে আলোর পাশে বসে প্রতুলবাবু বই পড়ছিলেন। বাড়িটা নিস্তব্ধ। সত্যেনকে দেখে প্রতুলবাবু শুধু বললেন, 'বসুন।'

সত্যেন বসল। প্রতুলবাবু মেপে মেপে দু-চারটে কথা বললেন। তারপর চুপ হয়ে গেলেন।

সত্যেন দময়ন্তীদেবীর কথা জিজ্ঞেস করতে প্রতুলবাবু মুখ তুলে বললেন, 'আজ ও অত্যন্ত টায়ার্ড—তাছাড়া শরীরটাও বোধহয় ওর ভাল নেই—তাই আমি বললুম কিছু খেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে।'

—'ও।' সত্যেন এমন ভাবে স্বরবর্ণটা উচ্চারণ করল, মনে হল প্রতুলবাবুর কথা তার বিশ্বাস হয়নি।

প্রতুলবাবু কী বলতে যাচ্ছিলেন—এমন সময়ে দময়ন্তীদেবী নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সত্যেন উঠে দাঁড়াল। দময়ন্তীদেবীকে সত্যিই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তিনি উদাস ভাবে সত্যেনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খবর? নমিতাকে নিয়ে কোথাও যাবার কথা আছে নাকি?'

সত্যেন সময় নিল নিজেকে সংযত করতে। তারপর বলল, 'না।'

দময়ন্তীদেবী অবসন্নের মত ধপ করে সোফায় বসে পড়লেন। দেখে সত্যেনের মায়া হল। নিজের আসন গ্রহণ করে বলল, 'আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম।'

দময়ন্তীদেবী হাসলেন।—'তাই নাকি? আমি আশা করতে পারিনি যে একবার দেখা হওয়া সত্ত্বেও আপনি আবার আসবেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। কোন জরুরী কথা আছে?'

সত্যেন গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, 'না—এমনি এসেছিলাম। অবশ্য জানতাম না যে আপনার শরীর ভাল নেই। জানলে আপনাকে বিরক্ত করতাম না।'

নিজের স্বাস্থ্যের সমালোচনা শুনে দময়ন্তীদেবী তিরিক্ষি হয়ে উঠলেন। বললেন, 'আমার শরীর ভাল নেই একথা আপনাকে কে বলেছে?' সঙ্গে সঙ্গে তাকালেন স্বামীর দিকে—'তুমি বলেছ নিশ্চয়।'

প্রতুলবাবু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'মানে, তুমি আজ খুব টায়ার্ড, তাই—।'

দময়ন্তীদেবী ক্লান্ত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকালেন। পরক্ষণে মাথাটা সোফার পিঠে হেলিয়ে দিয়ে বললেন, 'অস্বীকার করতে পারলুম না। বয়স হচ্ছে তা বুঝতে পারছি। আগে কখনও এত অল্পতে টায়ার্ড হতাম না। আজ আমি সত্যিই টায়ার্ড।'

সত্যেন সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'সেটা বয়সের দোষ নয়। আপনার শরীর যদি খারাপ হয় বয়স কী করবে বলুন? ছোট ছেলেদের শরীর কি খারাপ হয় না?'

দময়ন্তীদেবী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।—'তা হয়ত হয়।' বলে আবার চুপ করলেন। জীবনে তিনি একবারই মাতৃত্ব লাভ করেছিলেন। ছোট ছেলেকে কী করে মানুষ করতে হয় জানতেন না ভাল করে। উপদেশ দেবার মত লোকও তেমন ছিল না বাড়িতে। জ্বর হল, ছেলে কাঁদল। শুনলেন ছোট ছেলেদের ও রকম জ্বরজারি হয়েই থাকে। কান্না তো শিশুর ভূষণ। যখন ডাক্তার ডাকা হল, অনেক দেরি হয়ে গেছে। ডিপথিরিয়া মৃত্যুর কারণ বলে কাগজে সই করে দিয়ে গেলেন ডাক্তারবাবু।

দময়ন্তীদেবীর হঠাৎ হুঁশ হল। বললেন, 'কী যেন বলছিলাম? হ্যাঁ—বলছিলাম যে আমার বিশ্রামের সময় এসেছে। সবাইকার আসে। ভাল কাজ করলেও একটা বয়স এলে কর্মচারীকে বলা হয় —তুমি অনেক খেটেছ, মানলাম প্রাণ দিয়ে খেটেছ, কিন্তু এবার বিশ্রাম নাও। কারণ তোমার বয়স হয়েছে।'

সত্যেন বলল, 'আপনি তো কারুর তাঁবেদার নন। আপনার বেলায় সে কথা উঠছে কেন?'

প্রতুলবাবু হয়ত কিছু বলতেন। তাঁকে সুযোগ না দিয়ে দময়ন্তীদেবী বলে উঠলেন; 'আপনি এখানে নতুন এসেছেন, তাই হয়ত ভাল করে জানেন না আমার সঙ্গে বিষ্ণুপুরের সম্বন্ধ কী!' বলে একবার দম নিলেন। আবার শুরু করলেন—'সে যাই হোক, একথা আপনি নিশ্চয় বোঝেন যে বিষ্ণুপুরে আপনার যে সম্মান তা শুধু আপনার সিংহাসনের দৌলতে—আজ আপনি চলে গেলে কাল যিনি আসবেন তিনিও ঐ সম্মানই পাবেন। কিন্তু আমার বেলায় তা নয়। আমি সম্মানই পাই আর অসম্মানই পাই, সবটা আমার ব্যক্তিগত। কেউ আমায় ভালবাসেন, কেউ বাসেন না, কেউ প্রশংসা করেন, কেউ নিন্দে করেন—কিন্তু এমন কোন কথা নেই যে আমার স্থান অন্য কেউ দখল করলে আমার প্রাপ্য স্নেহ-ভালবাসা-প্রশংসা-সম্মান-খ্যাতি তারও উত্তরাধিকারসূত্রে পাওনা হবে।'

এতক্ষণে সত্যেন যেন দময়ন্তীদেবীর গোপন অভিমানের সন্ধান পেল। কিন্তু দময়ন্তীদেবীর বক্তব্য তখনও শেষ হয়নি। তিনি বলে গেলেন, 'আপনি উচ্চপদস্থ কর্মচারী। আপনি হয়ত আমার কথার মর্ম ঠিক বুঝতে পারবেন না। কারণ মেসিন-পার্টস-এর মত আপনারা মানুষ বদলাতে অভ্যস্ত।'

সত্যেন বাধা দিয়ে বলল, 'ক্ষমা করবেন। আপনি কী বলতে চান তা অস্পষ্ট রাখলেও আমি হয়ত কিছুটা বুঝতে পেরেছি। যাই হোক, আজ আপনি ক্লান্ত। আর একদিন এসে আপনার সঙ্গে সব কথা পরিষ্কার করে আলোচনা করব। এবং আমার সম্বন্ধে আপনার যদি কোন ভুল ধারণা জন্মে থাকে, তাও দূর করে দিয়ে যাব।'

দময়ন্তীদেবী সত্যেনের কথায় ক্ষান্ত হলেন না। বলে চললেন, 'আমি ক্লান্ত। তবে আজ শারীরিক ক্লান্তির চেয়ে মানসিক ক্লান্তিই

আমি বেশী অনুভব করছি। আর যত ভাবছি তত যেন আমার ক্লান্তি বেড়ে যাচ্ছে। —আমার এই কয়েক মাসের অনুপস্থিতিতে বিষ্ণুপুরে যে এতবড় একটা পরিবর্তন ঘটে যাবে আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি বিদেশে বসে আপনাদের অনেক খবর পেতাম, কিন্তু সব কথা বিশ্বাস করতাম না। —সব কথা বিশ্বাসও করা যায় না।' বলে দময়ন্তীদেবী হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর স্বর উত্তেজিত হয়ে উঠল। গালের ওপর নীল শিরাগুলো স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। মনে হল তিনি কোন স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হলেন। দময়ন্তীদেবী তবু চুপ করলেন না। বলে যেতে লাগলেন —'এ কী করে সম্ভব যে আমি যাকে নিরীহ, অনাথা, বলে আমার আশ্রয়ে এনে রেখেছিলাম, যাকে নিজের বোনের মত ভালবেসেছিলাম, মানুষ করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম, সে আজ আমায় সরিয়ে দিয়ে আমার আসন দখল করতে চায়?'

সত্যেন কী বলতে যাচ্ছিল, দময়ন্তীদেবী শুনলেন না। বললেন, 'কিন্তু, নমিতাকে আমি দোষ দিই না। সে সরল—এত সরল যে তাকে কেউ ভুল পথে নিয়ে গেলে 'যাবনা' বলার ঔদ্ধত্যও কেমন করে প্রকাশ করতে হয় সে জানে না। তাই আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে যে তার অধঃপতনের জন্যে সে যত না দায়ী, দায়ী তার এক পড়ে পাওয়া শুভাকাঙ্খী যাকে সে চেনবার আগেই বিশ্বাস করেছে।'

সত্যেন উঠে দাঁড়াল।

দময়ন্তীদেবী ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, 'একটু আগেই অস্পষ্ট কথা বলার জন্যে আমায় দোষ দিচ্ছিলেন। এখন আবার স্পষ্ট কথা শুনে চলে যাচ্ছেন কেন?'

—'চলে যাচ্ছি এই জন্যে যে আমি যাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম তিনি আর জীবিত নেই।' বলেই সত্যেন হন হন করে চলে গেল।

উনত্রিশ

সত্যেনের সঙ্গে দময়ন্তীদেবীর কথাবার্তা নমিতা আড়াল থেকে শুনছিল আর লজ্জায়, ভয়ে, ঠকঠক করে কাঁপছিল। সত্যেন চলে যেতেই সে অসুখের ভান করে শুয়ে পড়ল। সে রাত্রে মুখে কিছু দিতে পারল না।

সকালে উঠে নমিতা ভেবেছিল দিদির ওটা মনোবিকার। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে যা বলেছেন তার জন্যে দুঃখ পাবেন নিজেই, অনুতপ্ত হবেন। হয়ত সত্যেনের কাছে ক্ষমা চাইবেন। নমিতাকে ডেকে বলবেন, গুরুজনের কথা ধরতে নেই।

কিন্তু দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল—দময়ন্তীদেবীর অনুতাপের কোন লক্ষণই দেখতে পাওয়া গেল না। বরঞ্চ নমিতার ওপর তাঁর আক্রোশ ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগল। কারণে অকারণে তিনি নমিতাকে নানা অপ্রিয় কথা শোনাতে লাগলেন। এতদিন নমিতার মনে যত স্নেহ ভালবাসার ছাপ দিয়ে এসেছিলেন সব যেন রাতারাতি মুছে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ভাবলেনও না যে হৃদয়-নামক যে বস্তু রক্তমাংসের চেয়েও কোমল তার ওপর যে ছাপ একবার পড়ে তা তুলতে গেলে হৃদয় ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার হয়ে যাবারই সম্ভাবনা, যন্ত্রণার কথা তো আলাদা।

প্রতুলবাবু থাকতে না পেরে স্ত্রীকে বোঝাতে গিয়েছিলেন। তাঁকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে নমিতার ওপর অবিচার করা হচ্ছে।—দময়ন্তীদেবী তাই শুনে ক্ষেপে গেলেন। উত্তেজনা বেড়ে গিয়ে আবার তাঁর ফিট হতে লাগল।

খবর পেয়ে সত্যেন চুপ করে থাকতে পারল না। ভয় পেল দময়ন্তীদেবী যে কোন মুহূর্তে নমিতার ধৈর্যের শেষব্যূহ ভেদ করতে পারেন। তারপর নমিতা কী করবে বলা যায় না। সব কথা খুলে সত্যেন তাই বিরূপকে চিঠি লিখল। জানিয়ে দিল যে দময়ন্তীদেবীর কাছ থেকে নমিতাকে অবিলম্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার— নইলে দুজনেরই মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

বিরূপ পত্রপাঠ লিখল, 'নমিতাকে জিজ্ঞেস কর সে তার বিরূদার কাছে এসে থাকতে পারবে কি না। তবে আমার সংসার আপাততঃ স্ত্রীলোকবিহীন। নমিতা এলে আমি মাকে কলকাতা থেকে আনাবার ব্যবস্থা করতে পারি।'

সত্যেন চিঠিখানা নমিতার হাতে পৌঁছে দিল। নমিতা তার উত্তরে বিরূপকে লিখল, 'আমায় আশ্রয় দিতে চেয়েছেন তার জন্যে আমি আপনার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব। তবে আমি আপনাকে কষ্ট দিয়ে নিজের অপরাধের বোঝা আর বাড়াতে চাই না। আমার আশ্রয় আমি নিজেই খুঁজে নেব। আপনি আমার জন্যে ভাববেন না।'

নমিতার চিঠি পেয়ে বিরূপ সঙ্গে সঙ্গে সত্যেনকে লিখল যে সে বিষ্ণুপুরে যাচ্ছে নমিতাকে নিয়ে আসতে—নমিতা যেন তার বিরূদার ওপর বিশ্বাস না হারায়, নিজের ওপর বিশ্বাস না হারায়।

বিষ্ণুপুরে পৌঁছে বিরূপ সত্যেনের সঙ্গে দেখা করল প্রথমে। বলল, নমিতা যদি যেতে চায় সে আজই তাকে নিয়ে মুর্শিদাবাদে চলে যাবে। নয়ত আর কোনদিন ভাববে না নমিতার জন্যে। ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়ে যাবে তার ভবিষ্যৎ।

সত্যেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিরূপ সোজা গেল দময়ন্তীদেবীর কাছে। দময়ন্তীদেবী অবাক হয়ে গেলেন বিরূপকে দেখে।

জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার? অজ্ঞাতবাস করছিলেন, না পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন?'

বিরূপ ভণিতা করে সময় নষ্ট করল না। সোজাসুজি বলল, 'আমি নমিতাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

দময়ন্তীদেবী চীৎকার করে উঠলেন—'কী বললেন?'

বিরূপ হেসে বলল, 'নমিতা একটা অপয়া মণির মত যার কাছে যাচ্ছে তাকেই নাজেহাল করছে। আমার বাটপাড়ের ভয় নেই, আমায় বরঞ্চ মণিটা রাখতে দিন।'

দময়ন্তীদেবী আর মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। আরও গলা চড়িয়ে বললেন, 'আপনি? আপনি এসেছেন নমিতাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে? আপনার কী অধিকার আছে নমিতার ওপর?'

বিরূপ শান্ত ভাবে বলল, 'আমি কোন দাবি নিয়ে আসিনি। একথা ঠিক যে নমিতাকে আপনি শুধু আশ্রয়ই দেন নি—আপনি তার জন্যে যা করেছেন তা তার অতি আপনারজনও করত না। সেজন্যে নমিতা আপনার কাছে চিরঋণী থাকবে। কিন্তু আজ তার কোনও আশ্রয় নেই। তাকে একটা আশ্রয় খুঁজে দেওয়া আমার কর্তব্য।'

দময়ন্তীদেবী এবার রূঢ়তার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেন। বললেন, 'আপনি বোধ হয় জানেন না যে সেই সরল, অসহায়, মুখচোরা নমিতা যার দুরবস্থা দেখে আমি থাকতে পারিনি—যাকে জোর করে আমার আশ্রয়ে এনে রেখেছিলাম, আমার নিজের বোনের মত করে মানুষ করার চেষ্টা করেছিলাম, সে আজ কারুর তোয়াক্কা করে না। তার পায়ে লাখ লাখ টাকা ঢালবার মত লোক এখন পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনার কত টাকা আছে যে আপনি নিলাম ডেকে নমিতাকে কিনবেন?'

বিরূপ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'আমি নিলাম ডাকতে আসিনি। নমিতার চিঠি পেয়ে ওকে জানাতে এসেছি যে এখনও জগতের সব আশ্রয় ও হারায়নি।'

—'নমিতার চিঠি পেয়ে ? সে এতদিন তাহলে আপনার ঠিকানা জানত ? তাহলে আপনার আর নমিতার সম্বন্ধে যা রটেছিল তা সত্যি ?'

এমন সময় নমিতা ঘরে ঢুকল। দময়ন্তীদেবী চমকে উঠলেন। নমিতাকে মঙ্গলামামীর সংসার থেকে সরিয়ে নিয়ে আসবার দিন সে যে কাপড়খানা পরেছিল আজ তাই পরে সে এমন ভাবে দাঁড়াল কেন ? তবে কি সত্যিই নমিতা তাঁর আশ্রয় ছেড়ে বিরূপের সঙ্গে চলে যেতে চায় ?

দময়ন্তীদেবীর স্নায়ুগুলো যেন আলগা হয়ে গিয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল। তিনি দুহাতে সোফার হাতলদুটো শক্ত করে চেপে ধরলেন। নমিতা এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করে বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ত্রিশ

ট্রেনে উঠে নমিতা জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল। চলচ্চিত্রের মত বিষ্ণুপুরের পথঘাট-ঘরবাড়ি-গাছপালা তার চোখের সামনে দিয়ে সরে সরে যাচ্ছিল। যা ছিল তার ভবিষ্যৎ একটু পরেই তা অতীত হয়ে যাবে। যে একমুখো রাস্তা ধরে সে চলে এল সে রাস্তায় আর কোনদিন ফিরে যাওয়া যাবে না।

মঙ্গলামামীকে ছেড়ে আসায় তার 'বাপের বাড়ি'র সম্পর্ক ঘুচে গিয়েছিল। আজ দময়ন্তীদেবীকে ছেড়ে আসার পর 'শ্বশুরবাড়ি' বলতেও তার আর কিছু রইল না।

আজ নমিতা সম্পূর্ণ একা। তাতে আর ভিক্ষুনীতে কোন তফাত নেই।

—'আপনি কি কলকাতায় যাচ্ছেন?' নমিতা চমকে উঠল। যিনি প্রশ্ন করলেন তাঁর দিকে ফিরে ঘাড় নাড়ল শুধু। বিবাহিতা মহিলা—দময়ন্তীদেবীর বয়সীই হবেন—যে শাড়িটা পরে আছেন ঐ ধরনের একটা শাড়ি দময়ন্তীদেবীরও আছে।

ভদ্রমহিলা আলাপী। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

নমিতা জবাব দিতে পারল না। ঘাবড়ে গেল। ভাবল, ভদ্রমহিলা যদি জেরা শুরু করেন, কোন কথা থেকে কোন কথা বেরিয়ে পড়বে কে জানে! ভয়ে ভয়ে সে তাই বিরূপের দিকে তাকাল। বিরূপ সামনের বেঞ্চিটাতেই বসেছিল, ভদ্রমহিলার স্বামীর পাশে। মাঝখানের বেঞ্চি। এদিকে তার মন নেই। ঘাড় ঘুরিয়ে ওদিকের জানলাগুলোর দিকে সে চেয়ে চেয়ে ভাবছিল, মানুষের পা না থেকে গাছের পা থাকলে কী হত!

ভদ্রমহিলা স্বামীর দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে কী যেন বললেন। তারপর নমিতাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এখনও গান গান, না ছেড়ে দিয়েছেন?'

নমিতার মুখ শুকিয়ে গেল। ইতস্তত: করে উত্তর দিল, 'গান? আপনি বোধ হয় ভুল করছেন।'

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, 'অত লজ্জা পাচ্ছেন কেন? আপনাকে তো ট্রেনের মধ্যে গান গাইতে বলছি না। তবে, আপনার বিয়ের আগে আপনার গান আমি শুনেছি।'

নমিতা তবু মানল না যে ভদ্রমহিলার স্মৃতিশক্তি প্রখর। বললে, 'আপনি আর কারুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। গান আমি গাই না।'

ভদ্রমহিলার মুখখানা গোল হয়ে গেল। স্বামীর সঙ্গে তাঁর আবার কী গোপন আলোচনা হল। তাঁরা দুজনেই বিরূপের দিকে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চাইলেন।

বিরূপের ভ্রূক্ষেপ নেই। সে দেখছিল কামরার মধ্যে কে বসে বসে ঢুলছে, কে একটা বেঞ্চির যতটা পারে দখল করে অগাধে দিবানিদ্রা উপভোগ করছে।—আবার সে বাইরের দিকে তাকাল।

তখনও চৈত্রমাস পড়েনি। তবু ট্রেনের বাইরে রোদ্দুর যেন ঝাঁ ঝাঁ করছে। শান দেওয়া তরোয়ালের মত কোপ মারছে কামরার এক ধারে। থেকে থেকে গরম হাওয়ার ঝলকানি আসছে জানলা দিয়ে। হয়ত খানিকটা ধুলোও উড়ে এল তার সঙ্গে। কোন দুষ্টু ছেলে যেন এক মুঠো ধুলো উড়িয়ে দিল বাতাসে।

কলকাতা এসে গেল। বিরূপ তবু সময় পেল না সব কিছু গুছিয়ে ভাববার।

মায়ার বিয়ের খবর বিরূপ পেয়েছিল মুর্শিদাবাদে, বিয়ে হয়ে যাবার পর। তবু সঙ্গে সঙ্গে বিরূপ দাদাকে জানিয়েছিল নমিতার কথা। বিভূতি তার উত্তরে লিখেছিল, যা হবার তা হয়েছে, এখন মায়া যাতে জানতে না পারে তারই চেষ্টা করতে হবে—নমিতার কথা ভেবে কোন লাভ নেই—হেমাঙ্গিনীরও মত তাই।

কলকাতায় পৌঁছে বিরূপ তাই ভাবনায় পড়ল। মামার সংসারে নমিতা ফিরে যাবে না। তবে মা আর বৌদির কাছে সে অনেক শান্তিতে থাকতে পারত। বাড়ির মেয়ের মতই তাঁরা দেখাশুনো করতেন। কিন্তু মায়ার কথা ভেবে বিরূপের সাহস হল না নমিতাকে বাড়ি নিয়ে যেতে। অগত্যা মুর্শিদাবাদেই সে রওনা হয়ে গেল। শেয়ালদা থেকে ট্রেন ধরল রাত্তিরে।

মুর্শিদাবাদে অল্প ভাড়ায় বিরূপ একটা সুন্দর বাড়ি পেয়েছিল। একতলায় দুখানি ঘর, দোতালায় একটি। তাছাড়া রান্নাঘর-টান্নাঘর।

দোতালার ঘরখানা বিরূপ নমিতাকে ছেড়ে দিল। নীচের দুখানা ঘরের একটাতে সে টিউশান ক্লাশ করত। আর একটা এতদিন খালি ছিল—সেটা তার ঘর হল এবার।

সকাল-বিকেল বিরূপের টিউশান ক্লাশ বসত। দুপুরে কলেজ। সারাদিন তার ছেলে পড়িয়েই কেটে যেত।

নমিতার সময় কাটাবার কিছু ছিল না। বিরূপ একটা ঠিকে লোক রেখেছিল—তার নাম ভগলু। ঘরদোর পরিষ্কার করত, বাসন মাজত আর একবেলা রান্নাও করে যেত। নমিতা আসবার পরও বিরূপ তাকে ছাড়াল না। তবু নমিতা জোর করে হেঁসেলের ভার নিল।

দুটো লোকের রান্না। তাতে আর কতটুকু সময় কাটে! কাজের অভাবে নমিতা দুদিনেই হাঁপিয়ে উঠল। শুরু করল সামনেকার ছোট জমিটার সংস্কার। নিজের হাতে পরিষ্কার করে, মাটি খুঁড়ে, ফুলগাছ লাগাল দু-ধারে। শাকসবজির বীজও পুঁতল খানিকটা জায়গা জুড়ে।—কিন্তু গাছপালা ঘড়ির হিসেব মানে না। আজ চাই বললে আজই ফলফুল যোগাতে

পারবে না তারা। তারা আয়েশী প্রাণী। তাদের তোয়াজ করতে হবে, ভাল করে খেতে দিতে হবে, পোকা মাকড়ের উৎপাত থেকে বাঁচাতে হবে। তবেই তারা আস্তে আস্তে বাড়বে, মাসের হিসেবে, বছরের হিসেবে।

ঘড়ি আর ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে চেয়ে নমিতা অস্থির হয়ে উঠল।

বিরূপ লক্ষ করে বললে, 'তুমি যদি একটু বেশী লেখাপড়া শিখতে আমি তোমায় বলতাম মেয়েদের একটা টিউশান ক্লাশ খোলো। তবে একটা গানের ক্লাশ তুমি এখনও খুলতে পার।'

নমিতা ভাঙ্গল না যে গান গাওয়ার নাম শুনলে তার এখন ভয় করে। দিব্যেন্দুর মোহ, সর্বনেশে বিয়ে, দময়ন্তীদেবীর আক্রোশ সবই তো এই গানের জন্যে! এখন বাকী আছে শুধু সংসার-সমুদ্রে একা একা ভেসে যাওয়া। নমিতা শিউরে উঠল সে কথা ভাবতে। বিরূদা তার কেউ নয়, তবু এতবড় পৃথিবীতে বিরূদা আজ তার একমাত্র আত্মীয়। গানের জন্যে সে কি আবার বিরূদাকেও হারাবে?

নমিতা বললে, 'ক্লাশ-টুাশ চালাতে পারব না আমি। তার চেয়ে আপনি মেয়েদের টিউশান ক্লাশ খুলুন। আমায় ভরতি করে নিন আপনার ক্লাশে।'

বিরূপ খুশি হল। বলল, 'এ কথাটা মন্দ বলনি। সকালে মেয়েদের আর বিকেলে ছেলেদের ক্লাশ খুললে সবদিক বজায় থাকে।'

তাই ঠিক হল। বিরূপবাবুর বোনও একজন ছাত্রী শুনে সকালের ক্লাশে অনেক মেয়ে ভরতি হল।

সকাল-বিকেল এত ছাত্রছাত্রী পড়ান কম পরিশ্রমের কাজ নয়। তবে সে তুলনায় বিরূপের আয় হত না। তার চেয়ে বেশী রোজগার সে করতে পারত কয়েকটি বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারে প্রাইভেট টিউশানি

করে। কিন্তু দশজনকে বঞ্চিত করে একজনকে সাহায্য করতে বিরূপের বাধ বাধ ঠেকেছিল।

যাই হোক, বিরূপের ক্লাশে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই যেতে লাগল। সেই সঙ্গে বিরূপের খ্যাতি ও নমিতার মানও যে বাড়বে তা স্বাভাবিক।

কিছুদিন পরে নমিতা দেখল যে বিরূপবাবুর বোন বলে তাকে খাতির করতে শুরু করেছে পাড়ার অনেকে—সম্মানের সঙ্গে সে মিশতে পারছে মেয়েমহলে। নমিতার আত্মবিশ্বাস যেন ফিরে আসতে লাগল। বিরূদার ওপর বোনের দাবিও যেন সে খাটাতে শিখল এতদিন পরে।

একত্রিশ

বিরূপ নমিতাকে ঠাট্টা করে একদিন বলল, 'তুমি এসে আমার বরাত ফিরিয়ে দিলে দেখছি।'

নমিতা ভারিক্কী সুরে জবাব দিল, 'সেই সঙ্গে আপনার স্বাস্থ্যটাও ফিরলে বাঁচি।'

কথায় কথায় উঠল ক্লাশের কথা। বিরূপ চিন্তিত হয়ে বলল, 'এত ছাত্রছাত্রী কী করে সামলাই বল তো? আমি তো রোজই ভাবি তুমি কবে মেয়েদের ক্লাশটা আমার ঘাড় থেকে তুলে নেবে।'

নমিতা মাথা হেঁট করল। বলল, 'আমার কাছ থেকে প্রতিদান আশা করবেন না। মূল্য না দিয়ে গান শিখেছিলুম বলে অনেক বেশী মূল্য দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হয়েছি। আপনার কাছে তো আরও পাপ করছি—মূল্য তো দিচ্ছিই না, উপরন্তু ভাগ বসাচ্ছি আপনার রোজগারের ওপর।'

বিরূপ হেসে বলল, 'যতদিন না তোমার বৌদি ঘরে আসছে ততদিন তোমার কোন ভয় নেই।'

রসিকতাটা নমিতার পছন্দ হল না। জিজ্ঞেস করল, 'তারপর?'

—'তারপর দেখা যাবে তুমি আসল ভগ্নী কিনা—অর্থাৎ ভাইয়ের সংসার ভগ্ন করতে পার কিনা।'

নমিতার বুক দুরুদুরু করে উঠল। কথাটা বিরূপ ঠাট্টাচ্ছলে বললেও একথা ঠিক যে বিরূদা বিয়ে করলে নমিতাকে হতভাগিনী ভগিনী বলে মেনে নেওয়া না নেওয়া তাঁর একার ওপর আর নির্ভর করবে না। হয়ত নমিতাকে আবার কোন নতুন আশ্রয়ের খোঁজে বেরোতে হবে—বিতাড়িত কোকিলের মত।

বরাত ফিরলেও বিরূপ কিন্তু ভেবে ঠিক করল যে তার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আর বাড়ান চলবে না, বরঞ্চ কমাতে হবে। কারণ, যে ব্রতকে সে গ্রহণ করেছে তা স্বার্থত্যাগের—তার মধ্যে কেনাবেচার প্রশ্ন নেই। সে দাতা, তাই চিরদিন তাকে দিয়েই যেতে হবে, টাকা দিয়ে সে ঋণ কোনদিন কেউ শোধ করতে পারবে না। তা বলে দানের মধ্যে যদি কোন ত্রুটি থেকে যায় তারও ক্ষতিপূরণ সে কোনদিন করতে পারবে না টাকা দিয়ে। এ দায়িত্বও বড় কম নয়।

এইসব চিন্তা করে বিরূপ একদিন ক্লাশঘরের সামনে একটা হাতে-লেখা নোটিশ টাঙিয়ে দিল যে আপাততঃ কোন নতুন ছাত্র বা ছাত্রী নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। দুজন অভিভাবককেও সে ফিরিয়ে দিল কয়েকদিনের মধ্যে।

কিছুদিন বাদেই আর এক ভদ্রলোক কলেজে গিয়ে বিরূপকে ধরলেন তাঁর মেয়েকে ক্লাশে ভরতি করে নেবার জন্যে।

বিরূপ বলল, 'তা কী করে হয়? আমি সম্প্রতি দুজন অভিভাবকের অনুরোধ রাখতে পারিনি। যদি আপনার কথা রাখি তাঁরা কী ভাববেন বলুন!'

ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। বসে রইলেন। কলেজ ছুটি হবার পর বিরূপের সঙ্গ নিলেন। বাধ্য হয়ে বিরূপকেও হাঁটতে হল সাইকেল ধরে। ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে চললেন বিরূপের পাশে পাশে।

দুঃখের কাহিনী সন্দেহ নেই। ভদ্রলোকের মেয়েটি নাকি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং সুন্দরী। কিন্তু এমনই তার ভাগ্য যে বিয়ের সব ঠিকঠাক, হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় তার ভবিষ্যৎ চিরদিনের মত অন্ধকার হয়ে গেল।

—'সে কী!'

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন---'আমার বড় মেয়ে, তাই বড় আদরের সন্তান। নিজের অবস্থার কথা না ভেবে খাইয়েছি, পরিয়েছি,—লেখাপড়া, সেলাই-বোনা, ছবি আঁকা, গানবাজনা সব শিখিয়েছি, শুধু বড় ঘরে তার বিয়ে দেব বলে। মনের মতন সম্বন্ধও যোগাড় করেছিলুম। পাকা দেখা হয়ে গেল। এমন সময়—।'

গলা পরিষ্কার করার জন্যে ভদ্রলোক কেশে নিলেন।—'এমন সময় কার অভিশাপ লাগল কে জানে!'

—'কী হল? অসুখ বিসুখ?'

—'না। মেয়েটার সব ভাল, শুধু, কী জানেন, তার একটা রোগ—মানে, তাকে বৃষ্টিতে পায়—বৃষ্টি পড়লে সে আর ঘরে বসে থাকতে পারে না—বেরিয়ে যাবেই বৃষ্টিতে ভিজতে—কারুর কথা শুনবে না। আজ নয়, ছেলেবেলা থেকেই ঐ রকম। শুনেছেন কখনও?'

বিরূপ চুপ করে রইল।

ভদ্রলোক বলে চললেন, 'বিয়ের কদিন আগে—দুপুর থেকে খুব বৃষ্টি নেমেছে। সকলে বারণ করল—আজ আর পুকুরে গা ধুতে নাই গেলি—গা ধোয়া তো নয় চানই হয়ে যাবে, চুল শুকোবে না।—মেয়ে শুনল না। পুকুর ঘাটে চলে গেল, বৃষ্টিতে খানিকটা ভিজে আসতে।'

—'একলা?'

—'একলাই বরাবর যেত—বাড়ির পেছনেই পুকুর। তবে সেদিন সঙ্গে একজন ছিল। কিন্তু হলে হবে কী! পুকুর ঘাটের পেছল সিঁড়িতে পা হড়কে মা আমার এমন পড়ে গেল যে আর উঠে দাঁড়াতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেল। আমি আমার দিক থেকে কোন ত্রুটি রাখিনি। সব রকম চিকিৎসার চেষ্টা করলুম—কিন্তু অত করেও শেষকালে জানা গেল যে মা আমার কাঠের পা ছাড়া কোনদিন চলতে পারবে না।'

—'বলেন কী?' বিরূপের সত্যিই দুঃখ হল।

—'পা ভাঙ্গার জন্যে বিয়ে তো ভেঙ্গে গেলই, আর সেই থেকে আমার খোঁড়া মা কাঠের পা নিয়ে চলে বেড়াচ্ছে, ঘরের সব কাজকর্ম করছে, আমারই চোখের সামনে—তাই আমায় দুবেলা দেখতে হচ্ছে। মা-মরা ছেলেমেয়েদের কোনদিন শাসন করিনি বলে বোধ হয় ভগবান আমায় এমন করে শাস্তি দিলেন।' বলে ভদ্রলোক চশমা খুলে রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। একটু পরে আবার বললেন, 'মাঝে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছিল।

এখন আবার ম্যাট্রিক দেব দেব করছে। তাই আপনার কাছে এসেছিলুম যদি আপনি দয়া করে তার লেখাপড়ার ভার নেন। আমি সাইকেল-রিকসা করে ক্লাশে পৌঁছে দিয়ে যেতুম আবার নিয়ে যেতুম—তাতে আমার মেয়ের কোন অসুবিধে হত না।'

বিরূপ চুপচাপ হাঁটতে লাগল। দুজনের পায়ের শব্দের সঙ্গে তাল রেখে সাইকেলের চেনটা এক একবার করর্ করর্ করে সাড়া দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বিরূপ বললে, 'আমি আপনার বাড়ি গিয়েই আপনার মেয়েকে পড়িয়ে আসব। আমার ক্লাশের যা ফী তাই দেবেন।'

বত্রিশ

দিনকয়েক পরেই বিরূপ একদিন কলেজের ছুটির পর ভদ্রলোকের বাড়ির দিকে রওনা হল। সোমনাথবাবুর বাড়ি কোনটা জিজ্ঞেস করতে একটি ছোট ছেলে আমের রস গড়ান কনুই চাটতে চাটতে বললে, 'কোন সোমনাথবাবু? উকিল? মাথায় টাক?'

—'হ্যাঁ-হ্যাঁ।' বলে বিরূপ হেসে ফেলল।

ছেলেটি একটা সরু রাস্তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'সোজা চলে যান। ডানদিকে সাদা রঙের একতলা বাড়ি।'

বিরূপ সাইকেল ধরে ডানদিক চেয়ে চলছিল। দূর থেকে দেখতে পেল সাদা রঙের একতলা বাড়িটা। একটু এগিয়ে যেতেই বোঝা গেল সোমনাথবাবুর বাড়িই ওটা। বারান্দার রেলিংএর ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজোড়া কাঠের পা।

যার পা তাকে দেখা যাচ্ছিল না রেলিংএর ঘন বুনুনির ভেতর দিয়ে। তবে বোঝা যাচ্ছিল একটি মেয়ে রেলিংএর ধারেই বসে আছে।

মেয়েটি এত তন্ময় হয়ে কিছু একটা করছিল যে টের পেল না বিরূপ সাইকেলটা রেলিংএ হেলান দিয়ে রাখল, তারপর আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠল। বিরূপ মেয়েটির পেছনে দাঁড়িয়ে দেখল সে ছবি আঁকছে। তাই তার হুঁশ নেই।

বিরূপের সঙ্কোচ হতে লাগল কথা বলে মেয়েটির ধ্যানভঙ্গ করতে। সে পা টিপে টিপে একটু এগিয়ে গেল। ছবিটা এবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বিরূপের মনে হল মেয়েটি সূক্ষ্ম তুলির টানে বিরহী যক্ষকে ধরে আনবার চেষ্টা করছে। বিরূপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকা দেখতে লাগল।

হঠাৎ ছবির ওপর বিরূপের হাতের একটুখানি ছায়া পড়তে মেয়েটি চমকে উঠে ফিরে তাকাল। পেছনে একজন অপরিচিত পুরুষকে অমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অসহায় মেয়েটি ছুটে পালাতে পারল না। শুধু ছবিখানা আঁকড়ে ধরে মাথা নীচু করে বসে রইল। তার অবস্থা দেখে বিরূপ নিজেকে ক্ষমা করতে পারল না। সে কি শেষে পঙ্গুকে কশাঘাত করল? বিরূপ অনুতপ্ত হয়ে বলল, 'আমায় ক্ষমা করবেন।'

মেয়েটি কোন কথা না বলে যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল। বিরূপ তার লজ্জা ভাঙ্গাবার জন্যে বারান্দার কোণ থেকে একটা মোড়া টেনে আনল। মেয়েটির সামনাসামনি বসে জিজ্ঞেস করল, 'সোমনাথবাবু কখন ফিরবেন?'

মেয়েটি ছবিখানা কোলের ওপর উলটে রাখল। মুখ না তুলেই জবাব দিল, 'পাঁচটার পর।'

—'ও।' বলে বিরূপ হাতঘড়িটা দেখল। —'আর একদিন বরঞ্চ পাঁচটার পর আসব।'

মেয়েটি কিছু বলল না। বিরূপ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'মনে হচ্ছে আপনি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন নি। তাই আর একবার অনুরোধ জানিয়ে গেলাম।'

বিরূপ সিঁড়ি দিয়ে নেমে সাইকেলটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সাইকেলটা ঘুরোবে এমন সময় মেয়েটী রেলিং ধরে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'বাবাকে কিছু বলতে হবে?'

—'না। আমি আবার আসব।' বলে বিরূপ সাইকেলে চড়ে চলে গেল।

যেতে যেতে মেয়েটির লজ্জায় গুটিয়ে যাওয়া চেহারা বিরূপের চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। এও তার মনে হল—এমন কেন হয় যে ভগবান একহাতে অজস্র দেন আবার অন্য হাতে কেড়ে নেন!

সন্ধ্যাবেলা বিরূপ বাড়িতে ক্লাশ করছিল। একবার দরজার দিকে চোখ পড়তে দেখল সোমনাথবাবু বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি মারছেন। বিরূপ উঠে গেল।

সোমনাথবাবু বিরূপের হাতদুটো ধরে বললেন, 'শুনলাম আপনি দয়া করে আজ আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার বোকা মেয়ে আপনাকে চিনতে পারেনি। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

—'না-না। এতে মনে করার কী আছে? আমার একটু তাড়া ছিল বলে আমি চলে এলুম। আবার একদিন যাব। তাতে কী হয়েছে?'

সোমনাথবাবুর কুণ্ঠা গেল না। বললেন, 'আমি জানি আপনার মত শিক্ষিত লোক এত সামান্য কথা মনেও রাখেন না। তবু বনানী বলল যে তার অন্যায় হয়ে গেছে—সে আপনাকে নাকি বসতেও বলেনি।'

বিরূপ হেসে বললে, 'সে দিক থেকে তার কোন অন্যায় হয়নি। তার অন্যায় হয়েছে আপনাকে মিছিমিছি কষ্ট দিয়ে আমার কাছে পাঠান।'

সোমনাথবাবু আশ্বস্ত হয়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন সামনের রবিবার তিনি সারাদিন বাড়ি থাকবেন। বিরূপ যখন হোক একবার যেন যায়।

রবিবার সকালে বিরূপ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সোমনাথবাবুর বাড়িই যাবে বলে। কিন্তু আদ্ধেক রাস্তা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মনে হল বনানীকে সে পড়াতে পারবে না। সেদিন পঙ্গু মেয়েটি যখন চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে সে যেন বিরূপকেও দেখিয়ে দিয়েছিল তার মনের পঙ্গুতা। কোন লজ্জায় সে আজ গিয়ে দাঁড়াবে তারই সামনে শিক্ষাগুরু সেজে? মেয়েটি তার কাঠের পা দিয়ে লড়ছে তার পায়ের পঙ্গুতার সঙ্গে। কিন্তু বিরূপ কী দিয়ে লড়বে তার মনের পঙ্গুতার সঙ্গে? মেয়েটি পারে না—তবু চলতে চায়, ছুটতে চায়, খেলতে চায়, নাচতে চায়। আর বিরূপ? সে শুধু দেখল—তার জীবনে বারবার বসন্ত এল আর গেল। কিন্তু তার পঙ্গু মন হাসল না, কাঁদল না, দুলল না। সে এতদিন জানতেই পারেনি যে সে নিজে এত পঙ্গু। বনানীর অসহায় চাউনি যেন একটা তীব্র আলো ফেলে দেখিয়ে দিল যে তার চেতনা জড়সড় হয়ে হৃদয়ের এক কোণে পড়ে আছে—মৃতের চেয়েও স্থাণু, বনানীর পায়ের চেয়েও পঙ্গু।

কদিন ধরে বিরূপ অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে। নমিতা লক্ষ করছিল। একদিন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার শরীর খারাপ হয়নি তো?'

—'কেন বল তো?'

—'কী জানি! কিছুদিন ধরে আপনাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। খাওয়াদাওয়ায় রুচি নেই। আমার হাতের রান্না বোধ হয় আপনার ভাল লাগছে না। ভগলুকে বলব মাঝে মাঝে রেঁধে দিয়ে যেতে?'

বিরূপ হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল।—'কী যে বল? তোমার রান্না আর ভগলুর রান্না? আমার কিসসু হয়নি। তোমার ওসব মনের ভুল।'

তেত্রিশ

প্রথম বর্ষা নামবে নামবে করে আকাশে খুব তোড়জোড় চলছিল। মেঘের দল জমতে জমতে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলল, তবু যেন দলপতি বলছিলেন—এখনও হয়নি, আরও চাই।

অবশেষে একদিন বিকেলের দিকে ঘনঘটা করে অকাল রাত্রির মত অন্ধকার ঘনিয়ে বৃষ্টি নামল। প্রথম বৃষ্টির পরিপূর্ণ ফোঁটা ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটির ওপর—জীবন্ত, অথচ মৃত্যুর মত ঠাণ্ডা। অল্পক্ষণ বৃষ্টি হবার পরই রাস্তা, মাঠ, ঘাট জলে থই থই করতে লাগল।

বিরূপ বারান্দায় চেয়ার টেনে এনে বসে বসে দেখছিল বিরাট বারিপাতের ঘটা। তার মনে পড়ছিল কলকাতার কথা। এই নববর্ষার দিনে সে নিয়ঘাত চলে যেত গড়ের মাঠে, ফিরত সন্ধ্যার পর। বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতে বৌদি ছুটে আসতেন চায়ের পেয়ালা হাতে। হয়ত বলতেন, 'একটু আদার রস দিয়ে দেব?' বিরূপ একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল—'তার চেয়ে এক পেগ ব্র্যাণ্ডি দাও তো খেতে পারি।' বৌদি তেড়ে মারতে এসেছিলেন। বলেছিলেন, যে-বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে ব্র্যাণ্ডি খেতে হয় সে-বাহাদুরি নাই দেখালে!'

কলকাতার কথা ভাবতে ভাবতে বিরূপ আর বসে থাকতে পারল না। পা ছুঁড়ে পায়ের চটি দুটো ঘরের মধ্যে ফেলে দিয়ে বৃষ্টি মাথায় করে রাস্তায় নেমে পড়ল।

চলতে চলতে কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে বিরূপ টের পায়নি। নির্জন, অন্ধকার পথ ধরে সে হাঁটছিল—কোন চেনা পথ নয়—কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছিল তার হুঁশ ছিল না। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছিল এক একটা চলন্ত ছাতা, একটা টর্চ, অথবা সাইকেলের আলো।

হঠাৎ বিরূপকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। আর রাস্তা নেই। পথ শেষ হয়ে গেছে। সামনে একটা পুকুরঘাট। বিরূপের যেন চমক ভাঙ্গল। এই কি সেই পুকুরঘাট যেখানে পড়ে গিয়ে বনানী চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল? কোনটা বনানীদের বাড়ি? অন্ধকারে কিছুই বোঝা গেল না।

বিরূপ এগিয়ে গেল। শান বাঁধান বেঞ্চির ওপর বসে পড়ল। ঝম ঝম করে একটানা বৃষ্টি পড়ছে। একদিনের বৃষ্টিতে পুকুরের জল কানায় কানায় ভরে উঠেছে—একদিনের বৃষ্টিতে সবুজ লতার ক্ষীণ অঙ্গে যৌবন যেমন কানায় কানায় ভরে ওঠে। চারিদিক নিস্তব্ধ—শুধু ঝিঁঝির গানের মত বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ—গাছের

পাতায় তার এক ছন্দ, ঘাসে এক রকম, পুকুরের জলে অন্য রকম।

যেখানটায় বিরূপ বসেছিল সেখান থেকে পুকুরঘাটের রাস্তাটা সোজা দেখা যায়। এই অসময়ে কে আসবে ও রাস্তা দিয়ে? বিরূপ ভাল করে চেয়ে দেখল। মানুষের মূর্তিই বটে। মাথায় ছাতা নেই, হাতে আলো নেই, মাথায় ঘোমটা নেই, কাঁকে কলসী নেই। মূর্তিটা তবু এগিয়ে আসতে লাগল বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে। ওরও কি বাদলা-রোগ আছে? বিরূপ এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। মূর্তিটা আরও খানিকটা এগিয়ে আসতে বিরূপ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল। চমকে উঠল কী যেন দেখে। কে ও? বনানী? বনানী ছাড়া দুটো কাঠের পায়ে ভর দিয়ে কে আসবে অমন ভাবে এই অন্ধকারে বৃষ্টিতে ভিজতে?

বিরূপ নিজের অজ্ঞাতে চেঁচিয়ে উঠল বনানীর নাম ধরে।

যে আসছিল সে আর এগোল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে উলটো রাস্তায় কাঠের পা ঠুকে ঠুকে ফিরে যেতে লাগল।

তার দুর্দশা বিরূপ দূর থেকেই বুঝতে পারল। ছুটে গেল ডাকতে ডাকতে—'বনানী! দাঁড়াও।—বনানী!'

কাঠের পা দুটো আরও জোরে চলবার চেষ্টা করতে গেল। ভয় পেয়ে জড়িয়ে যেতে লাগল পায়ে পায়ে। আর এগোতে পারল না। মানুষশুদ্ধ রাস্তার ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেল।

বিরূপ দৌড়ে গিয়ে বনানীকে তুলে ধরল। বনানীর চোখে সেই অদ্ভুত, অসহায় চাউনি। লজ্জায়, ভয়ে, আড়ষ্ট তার শরীর। বিরূপ জিজ্ঞেস করল, 'কোথাও লাগেনি তো?'

লাগলেও বনানীর বোঝবার ক্ষমতা ছিল না। বললে—'না।'

তখনও বৃষ্টি পড়ছে। ভিজে জামাকাপড় জবজবে হয়ে লেপটে গেছে তার গায়ে। বিরূপের ঠাণ্ডা হাত তার বাঁ কাঁধটা ধরেই ছিল।

বনানীর তাই অস্বস্তি লাগছিল ভয়ানক। ক্রাচজোড়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ঘাড় ফেরাতে লাগল এদিক ওদিক। বিরূপ বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি মাটি থেকে একটা ক্রাচ তুলে তার হাতে দিল। আর একটা তুলতে গিয়ে দেখল সেটা ভেঙ্গে দু-টুকরো হয়ে গেছে। 'সর্বনাশ হয়েছে।'—বিরূপ ভয় পেয়ে গেল। ভাঙ্গা ক্রাচের টুকরো দুটো তুলে দেখাল বনানীকে।

বনানী বললে, 'একটা ধরেই আমি চলে যেতে পারব।' সত্যিই সে একটা ক্রাচে ভর দিয়ে দু-পা এগিয়ে গেল।

বিরূপ বললে, 'তোমার যেতে কষ্ট হচ্ছে—একটা হাত দিয়ে আমায় ধরে ধরে চল—লজ্জা কী?'

'তুমি' বলে ফেলার পর বিরূপের খেয়াল হল। বনানী কী ভাবে নিল কে জানে!

বনানী কোন কথা বলল না। একটা ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। বিরূপের সাহায্য নিল না।

বিরূপ ক্ষুণ্ণ হল। বলল, 'আমি ভাবছি, ও ক্রাচটাও ভেঙ্গে গেলে তুমি কী করতে!'

বনানী উত্তর দিতে দেরি করল না। বললে, 'তাহলে আমায় হামাগুড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরতে হত।'

বনানীর কথা শুনে বিরূপের পঙ্গু মন হঠাৎ যেন জঙ্গী হয়ে উঠল। সত্যিই কি সে বনানীর পঙ্গুতাকে ব্যঙ্গ করেছে যে বনানী ও কথা বলল? বনানী কেন বুঝতে পারল না যে বিরূপ শুধু চেয়েছিল সে তার বাহুর আশ্রয় নিক।—বিরূপের আত্মমর্যাদায় ঘা লাগল। তার মনে হল, বনানী কেন, যে কেউ এরকম বিপদে পড়লে সে সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হত না। তবে বনানীরই বা কিসের এত কুণ্ঠা? বিরূপের মাথায় দুর্বুদ্ধির রোখ চাপল। সে আকস্মিকভাবে বনানীর হাত থেকে ভাল ক্রাচখানা ছিনিয়ে নিয়ে হাঁটু দিয়ে দু-টুকরো করে রাস্তার

ধারে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আর বনানী কিছু বলবার আগেই তাকে দুই বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে পাঁজা করে তুলে এগিয়ে চলল রাস্তা দিয়ে। যেন একরাশ ভিজে তুলো বয়ে নিয়ে চলেছে সে।

ঘটনাটা এত আচমকা ঘটে গেল যে বনানী বুঝতেই পারেনি কী হল। কাতর হয়ে চাইল বিরূপের দিকে। তারপর কেঁদে ফেলল। ছেলেমানুষের মত হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলল, 'আমায় নাবিয়ে দিন। আমি যেমন করে পারি চলে যাব। আমায় ছেড়ে দিন।'

বিরূপ বলল, 'তার চেয়ে যদি বলি আমার হাতদুটো আজ থেকে তোমার ক্রাচেস বলে মেনে নাও, তুমি কি নেবে?'

—'জানি না। দয়া করে আমায় ছেড়ে দিন।' বনানী কাঁদতে কাঁদতে বলল।

বিরূপের কাছে বনানীর কান্নার কোন দাম নেই। সে বললে, 'আগে আমার কথার জবাব দাও।'

বনানী এবার তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলে উঠল—'আমার চলবার ক্ষমতা নেই বলে আপনি আমার উপর যে অন্যায় অত্যাচার করছেন এরই নাম কি পৌরুষ? আপনার পায়ে পড়ছি বিরূপবাবু—আমায় নাবিয়ে দিন।' বনানীর খোঁপা ভেঙ্গে পড়ল বিরূপের হাতে। হাতটা তার শিরশির করে উঠল।

নির্বোধের মত বনানীর মুখের দিকে চেয়ে বিরূপ তাকে নামিয়ে দিল। তার ভিজে ব্লাউজের হাত দুটো ধরে রইল তবু। বললে, 'তুমি কি এইটুকুই ভাবতে পারলে যে আমি কাণ্ডজ্ঞানহীন, উচ্ছৃঙ্খল?'

বনানী তখনও হাঁপাচ্ছে। বললে, 'আপনাকে আমি চিনি না। আপনাকে শুধু একদিন দেখেছিলাম। আমি জানি না আপনি ভাল না মন্দ, চরিত্রবান না উচ্ছৃঙ্খল। কিন্তু আজ আপনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন তা দিয়ে যদি আপনাকে বিচার করতে বলেন আমি বলব আপনি—।'

বিরূপ বাধা দিল। বললে, 'তুমি কি বোঝনি যে তোমার সঙ্গে একদিনের পরিচয় অশুচি হতে দেব না বলেই আমি তোমার সামনে মাষ্টার সেজে দাঁড়াতে চাইনি?'

বনানী এবার তাকাল মুখ তুলে।—'আপনার দয়া। আজও আপনি শুধু দয়া করার জন্যেই ছুটে এসেছিলেন। —কিন্তু আমি কারুর দয়া চাই না। আপনি ফিরিয়ে নিতে পারেন আপনার দয়া।'

—'শুধু দয়া হলে ফিরিয়ে নিতাম।' বলে বিরূপ বনানীর একটা বাহু জোর করে নিজের কাঁধে তুলে দিল। বললে, 'আমায় ধরে ধরে চল। তোমায় আগে বাড়ি পৌঁছে দিই।'

চৌত্রিশ

পরদিনই বিরূপ সোমনাথবাবুর কাছে বনানীকে বিয়ে করার কথাটা পাড়ল। সোমনাথবাবু কী করবেন, কী বলবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। পাগলের মত অনর্গল আশীর্বাদ করতে লাগলেন বিরূপকে। কোটি টাকা পেলেও এর বেশী আনন্দ পেতেন না তিনি। সুখবরটা চাউর করার জন্যে যেন ছটফট করতে লাগলেন। বিরূপ চলে যেতেই বেরিয়ে পড়লেন জামাজুতো পরে, ছাতি খুলে।

বাড়ি ফিরে বিরূপের ভাবনা হতে লাগল নমিতাকে নিয়ে। বিয়ের কথা লিখলেই সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা থেকে সকলে এসে হাজির হবেন। তাঁরপর বিয়েবাড়ির জমাট আড্ডায় নমিতার কাহিনী জানাজানি হয়ে যাবেই—শুধু মায়াই জানবে না, গোটা মুর্শিদাবাদ সহর জেনে যাবে। বলা যায় না ঐ অবস্থায় বিরূপের বিয়ে হবে কি না।

কী করে নমিতার কাছে কথাটা পাড়া যায় বিরূপ তাই ভাবছিল। কিন্তু আশা করেনি যে তার আগেই নমিতার কানে খবর পৌঁছে যাবে।

সন্ধ্যার দিকে রান্নাবান্না সেরে, গা ধুয়ে, কলতলা থেকে সবে নমিতা বেরিয়েছে—জামাকাপড় তখনও খালি গায়ে জড়ান, পরা হয়নি—এমন সময় পাড়ার মেয়ে করবী এল। সঙ্গে একটি বিবাহিতা মহিলা।—'আমার দিদি। কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন।' করবী বলল।

ভদ্রমহিলাকে দেখে নমিতা চমকে উঠল।—'ইনিই তো ট্রেনে গায়ে পড়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছিলেন!'

ভদ্রমহিলা কিন্তু হাসলেন নমিতার দিকে চেয়ে। জিজ্ঞেস করলেন, 'চিনতে পারছ?'

—'হ্যাঁ।' বলে নমিতা সকলকে বিরূপের ঘরে বসিয়ে জামাকাপড় পরে আসতে গেল।

নমিতা ফিরে আসতে করবী বললে, 'যাক, এতদিনে তোমার একজন কথা বলার লোক হল।'

নমিতা চুপ করে আছে দেখে করবীর দিদি অর্থপূর্ণ ভাবে করবীর দিকে চাইলেন। নমিতা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

করবী বলল, 'নমিতাদি বোধ হয় খবরটা শোনেনি! বিরূপবাবু কি সকাল থেকে বাড়ি ফেরেন নি?'

করবীর দিদি বললেন, 'কেন ফিরবেন না? বাইরের ঘরে যিনি ছেলে পড়াচ্ছেন উনিই তো বিরূপবাবু?'

করবীর যেন হুঁশ হল।—'তবে?'

নমিতা বিরক্ত হয়ে বলল, 'অত ভণিতা না করে, কী বলতে চাও, স্পষ্ট করে বল।'

করবী এবার হেসে বলল, 'বলছিলুম বিরূপবাবুর বিয়ের কথা। শুনেছ নিশ্চয় যে বিরূপবাবু বনানীর বাবার কাছে গিয়ে পাকাকথা দিয়ে এসেছেন?'

নমিতা শুকনো হাসি হেসে বলল, 'এই কথা? এতো পুরনো খবর। তোমরা বুঝি জানতে না বিরূদার বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে?'

করবী অবাক হয়ে গেল—'সে আবার কী? কথাবার্তা হচ্ছিল নাকি? তবে যে কাকাবাবু এসে বললেন, বিরূপবাবু হঠাৎ আজ সকালে তাঁর কাছে গিয়ে বিয়ের কথাটা পাড়লেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সব পাকা হয়ে গেল!'

নমিতা নিজেকে সামলে নিল। হেসে বলল, 'তোমার তো আর বিয়ে হয়নি!—তুমি ও সব বুঝবে না।'

কিছুক্ষণ পরে করবীরা চলে গেল। কিন্তু নমিতা নিশ্চিন্ত হতে পারল না। অজানা ভয়ে তার বুকটা দুরুদুরু করে উঠল।

ক্লাশ ভাঙ্গার পর বিরূপ বইখাতাগুলো তাকে তাকে সাজিয়ে রাখে। আজও রাখছিল। এমন সময় নমিতা ঘরে ঢুকল।

নমিতার মুখের দিকে চাইতেই বিরূপের সন্দেহ হল তার বিয়ের খবর নমিতা হয়ত জানতে পেরেছে। বিরূপ চুপ করে রইল।

বিরূদা কিছু বললেন না দেখে নমিতা সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল—'আমায় এমন ভাবে অপদস্থ করলেন কেন?'

—'মানে ?'

—'আপনি বিয়ে করবেন সে কথা আমাকে না জানানর ফলে পাড়ার লোক জেনে গেল যে বিরূপবাবুর বোন জানে না তার দাদার বিয়ে হবে।'

বিরূপ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'এত তাড়াতাড়ি পাড়ার লোকের কানে খবরটা পৌঁছে যাবে আমি ভাবতে পারিনি।. যাক—তুমিও যখন খবরটা পেয়ে গেছ, আমায় বলে দাও আমার কী করা উচিত।'

নমিতার ভুরু কুঁচকে গেল।—'কিসের কী করতে চান ?'

—'আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে বিয়ের খবরটা কলকাতায় জানান উচিত কি না।'

—'কী বলছেন আপনি ? আপনি বাড়িতে না জানিয়ে বিয়ে করবেন ?—কেন ?'

বিরূপ জবাব দিল না। নমিতা জবাব পেয়ে গেল। বললে, 'আমার জন্যে ? পাছে মায়া এলে তাকে আমি বলে ফেলি যে আমি তার লুকোনো সতিন ? ছি-ছি—আপনিও একথা ভাবতে পারলেন ! আপনি কি বোঝেন নি যে মায়াকে জানাবার হলে আমি অনেকদিন আগেই জানাতে পারতাম ?—একখানা চিঠি লিখলেই তো হত—আমি কি তার সঙ্গে দেখা হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকতাম ?'

বিরূপ লজ্জিত হল। বললে, 'তুমি কিছু মনে কোর না। দোষ আমারই—। তুমি আমায় ক্ষমা কোর।'

সেদিন নমিতার কথা শুনে করবীর মনে তেমন কোন সন্দেহ না জাগলেও তার দিদি বললেন, 'আমার বাপু বিশ্বাস হচ্ছে না যে নমিতা তোমাদের বিরূপবাবুর বোন।'

করবী বললে, 'তোমার আবার লোককে সন্দেহ করার একটু বাতিক আছে।'

—'ও!—আর আমি যদি প্রমাণ করে দিতে পারি যে নমিতা ভাল গাইতে পারে?'

—'তাতে আর কী যাবে আসবে?'

—'তাহলে এ কথা তো তোমরা মানবে যে নমিতা নিজের পরিচয় লুকোবার জন্যে ট্রেনে মিথ্যে করে বলেছিল যে সে গান জানে না?—তাছাড়া বোন হয়ে ভাইয়ের বিয়ের খবর না জানাও তো সন্দেহের কথা!'

—'তার কী মানে আছে! বড় ভাই কি সব সময়ে নিজের বিয়ের কথা বোনকে বলে? আর নমিতাদি যে বিয়ের কথা জানত না তাই বা তুমি মনে করছ কেন?'

—'ও সব বুঝতে তোর এখন অনেক দেরি আছে। বেশ তো, এবার যেদিন তোর সঙ্গে দেখা হবে, নমিতাকে জিজ্ঞেস করিস তো ওর বরের নাম কী, আর ও শ্বশুরবাড়িতে না থেকে দাদার কাছে থাকে কেন?'

করবীর ভাল লাগছিল না দিদির এই জুলুম—বিশেষ করে ভালকে খারাপ করে দেখার কৌতূহল। তাছাড়া দুদিন বাদে নমিতাদিদের বাড়িতেই ঘর করতে যাবে তার প্রাণের বন্ধু বনানী। সে তাই ঘাঁটাতে চাইছিল না নমিতাদিকে। বললে, 'তুমি তো কলকাতায় ফিরে যাচ্ছ—আমি তোমায় চিঠি লিখে সব জানাব অখন।'

করবীর দিদি তবু শান্ত হলেন না। সন্দেহের কাঁটা গলায় নিয়ে কলকাতায় ফিরে গেলেন এবং করবীর চিঠির প্রত্যাশা না করে নিজেই চিঠি লিখলেন কয়েকদিন বাদে। সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন পুরনো মাসিক পত্রিকা থেকে কাটা একখানি ফোটো। কুমারী

নমিতার নাম ছাপা রয়েছে তার তলায়। পদবীর নীচে ধ্যাবড়া করে লাল কালির লাইন টেনে দিয়েছেন করবীর দিদি।

ছবি দেখে করবীর আর অস্বীকার করার উপায় রইল না যে রক্তমাংসের নমিতাদিই জাল।

পঁয়ত্রিশ

বিরূপ বিয়ে করবে এ খবর পেয়ে বাড়িতে যেন আনন্দের ফুল ফুটল এতদিন পরে। হেমাঙ্গিনী পুজোয় বসেছিলেন। খবরটা কানে যেতেই গঙ্গাজলের টোকা দিয়ে, জোরে জোরে কয়েকবার মেঝেতে মাথা ঠুকে, পূজো বন্ধ করে উঠে পড়লেন। বললেন, 'ঠাকুর, দোষ নিও না। এ তো তোমারই কাজ। তুমি ছাড়া এ অসাধ্যসাধন আর কে করবে!'

হেমাঙ্গিনী পূজোর ঘর থেকে বেরতেই বৈঠক বসল। পাঁজি দেখে মুর্শিদাবাদে যাবার তারিখ তখনই ঠিক হয়ে গেল। সুনীলার ওপর ভার পড়ল পুরনো কাগজের বাক্স থেকে বিভূতির বিয়ের তত্বতাবাস আর আত্মীয়কুটুমের ফর্দগুলো বার করা। বিভূতিকে হেমাঙ্গিনী বললেন, 'কাল আপিস ফেরত মায়ার বাড়িতে একবার খবরটা দিয়ে আসিস, আর বেয়াই-বেয়ানের মত নিয়ে আসিস যাতে মায়া আর দিব্যেন্দু আমাদের সঙ্গেই যেতে পারে।'

বিভূতি নমিতার কথা তুলতে হেমাঙ্গিনী বললেন, 'তা হোক। এই সুযোগে পাকা ফোড়ার পুঁজ বেরিয়ে যায় তো ভালই।'

রাত্রে মায়ার কাছে বিরূপের বিয়ের খবর পেয়ে দিব্যেন্দু গুম হয়ে গেল।

বিয়ের পর দিব্যেন্দু যখন জানতে পারে যে মায়া বিরূপবাবুরই বোন, তার ভয় হয়েছিল মায়া তার লুকোনো বিয়ের কথা হয়ত দুদিনেই জেনে ফেলবে। কিন্তু পরে বুঝেছিল যে মায়ার বাড়ির সকলের চেষ্টা মায়া যেন না জানতে পারে দিব্যেন্দুর কেলেঙ্কারির ইতিহাস। দিব্যেন্দুও তাই হুঁশিয়ার হয়ে চলছিল এতদিন।

নমিতার খোঁজ না রাখলেও দিব্যেন্দু শুনেছিল যে নমিতা বিরূপবাবুর সঙ্গে বিষ্ণুপুর ছেড়ে চলে গিয়ে মুর্শিদাবাদে রয়েছে। মায়াও সে খবরটা জানত, এও জানত যে নমিতার বিয়ের পর তার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গেছে—শুধু জানত না যে দিব্যেন্দুই নমিতার সেই জলজ্যান্ত স্বামী।

দিব্যেন্দু চুপ করে আছে দেখে মায়া জিজ্ঞেস করল—'কী হল? কথা বলছ না যে?'

দিব্যেন্দু গম্ভীর হয়ে বলল—'তোমার যাওয়া হবে না।'

মায়া দিব্যেন্দুর গাম্ভীর্যের পরোয়া করল না। বললে, 'বা-রে, আমার দাদার বিয়ে, আর আমি যাব না? তুমি 'না' বললে কী হবে? বাবা আমায় নিজে ডেকে বলেছেন যে তোমাকে নিয়ে আমায় মুর্শিদাবাদে যেতে হবে।'

দিব্যেন্দুর মেজাজ চড়ে গেল। বললে, 'তোমার যাওয়াতে আমার আপত্তি আছে। তা সত্ত্বেও তুমি যদি যাও তো—।'

—'তো-কী? আমায় ত্যাগ করবে?'

দিব্যেন্দু দ্বিধা না করেই বলল, 'দরকার হলে তাই করতে হবে।'

মায়ার চোখনাক কথা বলে উঠল—'ঈস—ত্যাগ করা অমনি মুখের কথা কি না। বিয়ে করলুম আর ত্যাগ করলুম। এ কি জামাকাপড় পেয়েছ? যে, পরলুম আর ফেলে দিলুম? —তুমি না যাও আমি একলাই যাব। দেখি তুমি কী করতে পার।'

—'বেশ। কিন্তু পরে আমায় দোষ দিও না।'

মায়া দিব্যেন্দুর ভয় দেখান মানল না। মা, দাদা, বৌদির সঙ্গে মুর্শিদাবাদে চলে গেল।

নমিতাকে দেখবার জন্যে মায়া ছটফট করছিল। নানান ধারণা তার মনের মধ্যে জমা হয়েছিল। —কারণ মায়া ঠিক জানত না যে নমিতার স্বামী বেঁচে আছেন কি নেই, নমিতার কোন ছেলেপুলে হয়েছে কি না। তাই নমিতাকে কী ভাবে যে দেখবে মায়া তার কোন আন্দাজই করে উঠতে পারছিল না।

নমিতার মাথায় সিঁদুর দেখে মায়ার একটা ভাবনা দূর হল। তাড়াতাড়ি ছুতো করে নমিতাকে টেনে নিয়ে গেল ছাদে। জিজ্ঞেস করল—'হ্যাঁরে, কী ব্যাপার ?'

নমিতা মায়াকে দেখে হাসল, স্বামীর কথা জিজ্ঞেস করতে কাঁদল, কিন্তু আসল কথা কিছু বলল না। মায়া রেগে মেগে বলল, 'আমার কাছেও মনের কথা খুলে না বলতে পারিস তো মর নিজে নিজে পুড়ে।'

মায়া শেষকালে ছোটদাকেও ধরেছিল নমিতার গোপন ইতিহাস তাকে চুপি চুপি বলবার জন্যে—আর কাউকে সে বলত না, মরে গেলেও না—তবু ছোটদা বিশ্বাস করে বলতে পারেনি। শুধু সান্ত্বনা দিয়েছিল—'ব্যস্ত হয়োনা। সময় মত সব জানতে পারবে।'

বিয়েবাড়ির গোছগাছ শুরু হয়ে গেছে, পাকাদেখা হয়ে গেছে, আর কদিন বাদেই বিয়ে। এমন সময় করবী একদিন নমিতা আর মায়াকে নেমন্তন্ন করে গেল তাদের বাড়ি চা খেতে।

নমিতার যাবার ইচ্ছে ছিল না। মায়াই জোর করল। বললে করবী যখন বাড়ি এসে বলে গেছে, না যাওয়াটা খারাপ দেখায়।

বিকেল বেলা নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গিয়ে মায়াই বোকা বনে গেল। করবীদের বাড়িতে টি-পার্টির নামগন্ধ নেই—করবীর তখনও চুলই বাঁধা হয়নি! চুলের দড়িটা লাগামের মত কামড়ে ধরে সে বললে, 'মায়াদি কলকাতা থেকে এসেছে, তাই ওর সঙ্গে একটু ভাব করবার জন্যে তোমাদের চা খেতে বলেছিলুম।'

মায়া খুশি হল। বললে, 'ভালই করেছ আর কাউকে না বলে। আমি তো ভয় করছিলুম অচেনা লোকেদের মাঝখানে বুঝি বা মুখ বুজে বসে থাকতে হয়।'

নমিতার কিন্তু সন্দেহ হয়েছিল করবীর রকমসকম দেখে। তাই সে ব্যস্ত হয়ে উঠল বাড়ি যাবার জন্যে। বললে, 'অনেক কাজ পড়ে আছে। গায়ে হলুদের তত্ত্ব কিছুই সাজান হয়নি।'

করবী হেসে বলল, 'তার জন্যে ভেবনা। মা-বৌদি যখন এসে গেছেন তখন আর কোনদিকে আটকাবে না।' তারপর হঠাৎ সরলভাবে নমিতাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা নমিতাদি, তুমি তো বিয়ের আগে 'গাঙ্গুলী' ছিলে—তাহলে লোকে তোমায় বিরূপবাবুর বোন বলে কেন?'

নমিতা লজ্জায় বোবা হয়ে গেল। মায়া কিন্তু লজ্জার কোন কারণ খুঁজে পেল না। বললে, 'একদিন নমিতা আর আমাতে এত ভাব ছিল যে সকলে জানত আমরা দুই বোন।'

মায়া করবীর আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি। কিন্তু নমিতা বুঝেছিল। সে ভয় করছিল যে তার পদবীটা করবীর নতুন আবিষ্কার এবং হয়ত অনেক অপ্রিয় প্রশ্নের ভূমিকাস্বরূপ পদবীর কথাটা করবী আগে পাড়ল। নমিতার ভয় মিথ্যে নয়। করবী এবার মায়াকে জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা ভাই মায়াদি, নমিতাদির

স্বামী কী করেন ? আমি একদিন কত সাধলুম, নমিতাদি কিছুতেই বলল না। আমি তো জানতুম সেকেলে গিন্নীরা স্বামীর নাম উচ্চারণ করেন না। কিন্তু স্বামীর পেশা বলতে আপত্তি আমি নমিতাদিকেই প্রথম দেখলুম।'

মায়া ফাঁপরে পড়ল। একটু আগেই নমিতার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার যে পরিচয় সে দিয়েছে তাতে এখন হাস্যকর শোনাবে যদি মায়া বলে যে নমিতার স্বামীর পেশা কী তা সে নিজেও জানে না। কথাটা তাই সে ঘোরাবার চেষ্টা করল। বলল, 'কী জান ভাই, ওদের লাভম্যারেজ হয়েছিল। সেইজন্যে সকলকার কাছে স্বামীর পরিচয় ও দিতে চায় না। লজ্জা করে আর কি !'

করবী এ উত্তরে সন্তুষ্ট হল না। বললে, 'লাভ না হয় লুকিয়ে হয়েছিল—কিন্তু ম্যারেজটা লুকিয়ে রাখলে লোকে মানবে কেন যে সত্যি সত্যি বিয়ে হয়েছিল ?'

মায়া রেগে উঠল। বললে, 'লোকে না মানে তো বড় বয়েই গেল। যখন প্রমাণ দেবার দরকার হবে নমিতা দেবে। তাবলে যে-সে জবাবদিহি চাইলেই নমিতা তা দিতে বাধ্য নয়।'

নমিতা মায়াকে বলল, 'বাড়ি চল—আমার শরীরটা কেমন করছে।'

নমিতা আর মায়া উঠে দাঁড়িয়েছিল—এমন সময় করবীর মা এলেন। চায়ের নেমন্তন্নটা একেবারে মিথ্যে নয়। দুটো রেকাবে খাবার নিয়ে এসেছেন দুজনের জন্যে।

মায়া বললে, 'এখন আর কিছু খাব না, মাসিমা। আর একদিন এসে খেয়ে যাবখন।'

করবীর মা ভালমানুষ। বললেন, 'এ আবার কী কথা ? কিছু না খেয়েই চলে যাবে ?'

করবী মাকে সাধতে দিল না। বললে, 'নমিতাদির হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে—এখন আর ওদের খাবার সময় নেই।'

করবীর মা নমিতার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে আলুর পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাইরে বেরিয়ে এসে মায়া বলল, 'উনি এসেছিলেন আমার সঙ্গে ডেঁপোমি করতে! কেমন শুনিয়ে দিলুম?'

নমিতা কিন্তু অত হালকা করে নিতে পারল না ঝগড়াটা। ভয়ে ভয়ে বললে, 'কিন্তু করবী যদি এই নিয়ে আবার দশ কথা রটিয়ে বেড়ায়?—বিরূদার বিয়েতে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করে?'

—'তুই থাম্। আমরা কি মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের কেঁচো হয়ে থাকতে হবে? বেশী চালাকি করলে আমরাই বিয়ে ভেঙ্গে দেব। আর যাই হোক, এটা তো ঠিক যে বাংলাদেশে কনের অভাব হবে না? কত বুড়োহাবড়া, দোজবরের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে—আর ছোটদার বিয়ের জন্যে ভাবনা—হুঁঃ! আর ঐ তো খোঁড়া মেয়ে!'

করবী কিন্তু ঠিক করল, অত সহজে ছেড়ে দেবে না মায়াদিকে, বিশেষ করে তার বন্ধু নমিতাদিকে। এস্পার ওস্পার সে একটা করবেই। তাছাড়া, পথ তো মায়াদিই দেখাল! মায়াদি যদি তার অন্তরঙ্গ বন্ধুর পক্ষ নিয়ে দুকথা শুনিয়ে যেতে পারে তাহলে করবীই বা তার অন্তরঙ্গ বন্ধু বনানীর হয়ে লড়বে না কেন? অন্ততঃ বন্ধুর ভালর জন্যেও নমিতাদির ব্যাপারটা যাচিয়ে নেবার অধিকার তার আছে।

করবী চলে গেল বনানীদের বাড়ি। তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সঙ্গে বিরূপবাবুর এত গভীর প্রেম, আর এ কথা তিনি তোমায় বিশ্বাস করে বলতে পারলেন না যে নমিতাদির সত্যিই বিয়ে হয়েছে কি না, আর যদি হয়ে থাকে তবে ওঁর স্বামী কোথায়? তাঁর পরিচয় কী?'

—'এখন এসব আলোচনা করে লাভ কী?'

—'লাভ না থাকে তো বিয়ের পর যখন সমস্ত কেলেঙ্কারি বেরিয়ে পড়বে তখন মাথা খুঁড়ে মোরো।'

—'কার কেলেঙ্কারি? কিসের কেলেঙ্কারি?'

বনানীর কথায় করবী রেগে উঠল। বললে, 'অত ভালমানুষ সাজিসনি বনানী! এখনও সময় আছে। স্পষ্টাস্পষ্টি বিরূপবাবুকে জিজ্ঞেস করে নে যে নমিতা বামুনের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁর বোন সেজে এতদিন তাঁর কাছে রয়েছে।'

—'সে আমি পারব না।'

—'তাহলে আমিই তোর হয়ে জিজ্ঞেস করব।'

—'লক্ষীটি করবী, আমার মাথা খাস—ওসব করতে যাসনি।—নমিতা যাই হোক, ওঁকে এর মধ্যে জড়াসনি।'

—'ঈস—ওঁকে! উনি যেন তোর জন্মজন্মান্তরের স্বামী! তুই মনে করিসনি উনি তোকে দয়া করে বিয়ে করছেন। তোর রূপে মুগ্ধ হয়ে তোকে বিয়ে করার কথা উনি নিজেই যেচে পেড়েছিলেন। তবে তোর অত নীচু হয়ে থাকার কী আছে? একটা পা খোঁড়া বলে? কেউ তো আর বৌয়ের পা ধুয়ে জল খায় না!'

বনানী তবু হই চই করতে বারণ করল। করবী শুনল না। নমিতাদির আসল পরিচয় না জেনে বিরূপবাবুর হাতে বনানীকে সমর্পণ করা কাকাবাবুর উচিত হচ্ছে না এই খাঁটি সত্যটুকু সে প্রচার করে বেড়াতে লাগল।

সোমনাথবাবু করবীর উপদেশে কর্ণপাত না করলেও কথাটা কানে কানে ঘুরে ক্রমশঃ একটা কদর্য রূপ নিতে লাগল। স্বজন-বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ ইঙ্গিত প্রকাশ করলেন যে তাঁরা এ বিয়েতে থাকবেন না। অবশেষে পাড়ার কয়েকজন পরোপকারী যুবক সোমনাথবাবুকে উহ্যাকারে ভয় দেখাল যে ব্যাপারটা না মিটলে বিয়ের দিন গোলযোগ হবার সম্ভাবনা

থাকবে—কারণ, তারা এত সহজে একজন পরবাসীকে তাদের পাড়ার মেয়েকে ফাঁকি দিয়ে সাত পাক ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে দেবে না।

সোমনাথবাবুর চুপ করে থাকা চলল না। পাঁচজনের পরামর্শ তাঁকে নিতে হল। বৈঠকে স্থির হল বিরূপবাবুকে গিয়েই বলা হোক এর একটা মীমাংসা করে দিতে।

পরদিন সকালে সোমনাথবাবু মাতব্বরের দল নিয়ে বিরূপের বাড়ি হাজির হলেন। বিভূতি বেরিয়েছিল বাজার-হাট করতে। বিরূপ বাড়িতেই ছিল। বিরূপকে বারান্দায় ডেকে কিছুক্ষণ প্রবন্ধ গাইবার পর সোমনাথবাবু আস্তে আস্তে কথাটা পাড়লেন।—'দেখ বাবা, আমরা একটা বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি। তুমি শুনে রাগ কোর না। বিশ্বাস কর, আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা তোমায় ভাল করেই চিনি। কিন্তু—কয়েকজন বাজে লোক তোমাদের বিয়েতে বাধা দেবার জন্যে—মানে তোমার ভগিনীতুল্যা নমিতার নামে একটা কথা তুলেছে। তুমি শুনে রেগে যেওনা। —তারা বলছে যে নমিতা বিবাহিতা, অথচ সে যখন তোমার সত্যিকারের বোন বা কোন আত্মীয়া নয়, তখন সে তোমার কাছেই বা আছে কেন, আর তার স্বামীর পরিচয়ই বা সে লুকোচ্ছে কেন?'

বিরূপ গম্ভীর হয়ে বলল, 'দেখুন, মানুষের জীবনে গোপনীয় কথা থাকলেই যে তার কারণটা দোষের হবে তা ভাবা উচিত নয়। নমিতা আমার বোন নয় বটে তবে তাতে আর আমার নিজের বোনে কোন তফাত নেই। আর নমিতা সধবা হয়েও তার শ্বশুরবাড়িতে না থেকে আমার কাছে রয়েছে তার কারণ, মেয়েরা স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বনিবনা না হলে বাবার কাছে আর বাবা না থাকলে দাদার কাছেই যায়।'

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে বললেন, 'এক শ বার! যত সব অকালকুষ্মাণ্ড ছেলেমেয়েদের কাণ্ড। শুধু একটা গোলমাল পাকিয়ে বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার ফিকির।'

সঙ্গে সঙ্গে আর এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন—'বিরূপবাবুর সব কথা আমরা মেনে নিলুম, কিন্তু আমরা ওঁকে শুধু একটা অনুরোধ জানাচ্ছি—উনি যদি নমিতাদেবীর স্বামীর নাম ও পরিচয় বলে আমাদের সন্দেহ দূর করেন! সকলকে বলতে আপত্তি থাকলে উনি আমাদের মধ্যে যে কোন একজনকেও গোপনে বলতে পারেন।'

বিরূপ কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। তারপর বলল, 'আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি নমিতাকে জিজ্ঞেস করে আসি তার কোন আপত্তি আছে কি না।'

জানলার পাশে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে মায়া আর নমিতা সব কথাবার্তা শুনছিল। বিরূপের কথা শেষ হতেই নমিতা ছুটে পালাতে গিয়েছিল। মায়া আঁচল টেনে ধরল। ধমক দিয়ে বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস? দাঁড়া।'

বিরূপ ঘরে ঢুকে দুজনকে দেখে চমকে গেল। দেখল ভেতরে যাবার দরজা বন্ধ। নিশ্চয় এ মায়ার কাজ। মা আর বৌদিকে আড়ালে রাখার ব্যবস্থা। বিরূপ মায়াকেই বলল চাপা গলায়—'তোমরা তো সব শুনেছ, এখন তোমরাই বল ভদ্রলোকদের কী জবাব দেওয়া উচিত।'

মায়া বলল, 'ভদ্রলোক নয়, বল ছোটলোক।' নমিতা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি মায়ার মুখ চেপে ধরল। —'চুপ চুপ—কী করছিস?'

মায়া নমিতার হাত ছাড়িয়ে বলল—'তুই থাম্—আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কী করে ওদের জব্দ করতে হয়। তুই শুধু বল্, আমি যা বলব তুই তা করবি কি না।'

—'কী?' নমিতা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

—'তুই রাজী হবি তোর স্বামী আর শ্বশুরের নাম বলতে। আর ওদের মুখের ওপর আমার স্বামী আর শ্বশুরের নাম জোর গলায় বলে আসবি।'

নমিতা থরথর করে কাঁপতে লাগল। বললে, 'না-না। আমি তা পারব না।'

—'পারব না মানে? তোকে পারতেই হবে। যেমন কুকুর তার তেমনি মুগুর।' তারপর নরম সুরে মায়া আবার বলল—'শোন্—তোর নিজের স্বামীর পরিচয় যদি না দিতে চাস তো আমি যা বলছি তাই কর। এতে কোন দোষ হবে না। আর উনি সেজন্যে রাগ তো করবেনই না, বরঞ্চ দরকার হলে এই চণ্ডালগুলোর সামনে তোর যাতে মান রক্ষা হয় তার ব্যবস্থা করবেন।'

মায়ার কথা শুনে বিরূপ রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

নমিতা না-না করা সত্ত্বেও মায়া তার কানে কানে বলল—'তুই গিয়ে বল, তোর স্বামীর নাম শ্রীদিব্যেন্দু চৌধুরী—আর তোর শ্বশুরের নাম শ্রীপরিতোষ চৌধুরী।'

নমিতা অসহায়ের মত বিরূপের দিকে তাকাল।

বিরূপ তাড়াতাড়ি জটিল সমস্যার সমাধান করে দিয়ে বললে, 'মায়া যা বলছে তাই কর নমিতা—তাতে কোন দোষ হবে না।'

নমিতা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

মায়া নমিতার পিঠে হাত দিয়ে বলল, 'এতে তোর কাঁদবার কী হল? আমি তো তোর ভালর জন্যেই বললুম! আমার কথা পছন্দ না হয় তুই যা প্রাণ চায় তাই কর। নিজের স্বামীর পরিচয় দিতে চাস তাই দে—নয়ত মুখের ওপর বলে আয়—আমি বলব না। ল্যাঠা চুকে গেল।'

নমিতা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। আঁচল দিয়ে বার বার চোখের জল মুছে শেষকালে বারান্দার দিকে এগোল। বিরূপ পেছন পেছন গেল। মায়া জানলা ঘেঁষে কান খাড়া করে দাঁড়াল। শুনতে পেল নমিতা গম্ভীর হয়ে ভদ্রলোকদের বলছে—'আপনারা যদি আমার স্বামীর পরিচয় পেলেই সন্তুষ্ট হন তাহলে শুনুন—আমার স্বামীর নাম শ্রীদিব্যেন্দু চৌধুরী।'

কে একজন জিজ্ঞেস করলেন—'আপনার শ্বশুরের নাম?'

—'শ্রীপরিতোষ চৌধুরী।'

—'কোন পরিতোষ চৌধুরী? বিখ্যাত পি, চৌধুরী এণ্ড সন্‌সের মালিক—তিনি নন তো?'

বিরূপ ঘাড় নেড়ে বলল—'হ্যাঁ।'

প্রশ্নকর্তা বিস্মিত হয়ে নমিতাকে বললেন, 'বলেন কী? অত নামকরা বড়লোক আপনার শ্বশুর আর তাঁর পরিচয় আপনি লুকিয়ে রেখেছিলেন?'

এবার মনে হল সকলেই লজ্জা পেয়েছেন। একজন বললেন, 'ছি-ছি। আমাদের খুব অন্যায় হয়েছে পরের কথায় নেচে আপনাদের ওপর এ ভাবে অত্যাচার করা।'

আর একজন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'যাক—যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, কিছু মনে করবেন না। বুঝতেই তো পারছেন—আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক—অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ি।'

সোমনাথবাবু গদ গদ হয়ে নমিতার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'আশীর্বাদ করি মা, তুমি রাজরাজেশ্বরী হও। আজ তুমি আমায় শুধু বিপদ থেকে উদ্ধার করলে না, আমার মুখ উজ্জ্বল করলে। এবার বুঝতে পারছি, মা অন্নপূর্ণা শিবের ওপর রাগ করে কেন বাপের বাড়িতে এসে রয়েছেন।'

ভদ্রলোকেরা চলে যেতে মায়া নিজের বাহাদুরির আনন্দে আটখানা হয়ে নমিতার গাল টিপে বলল, 'ভাগ্যিস আমি

এসেছিলুম—নইলে ছোটদার বিয়েও হত না, আর তোকেও ঐ জানোয়ারগুলো দেশছাড়া না করে ছাড়ত না।—কিন্তু দেখিস, বিয়ের আগে আবার সব ফাঁস করে দিসনি যেন।'

সেদিন রাত জেগে মায়া দিব্যেন্দুকে এক লম্বা চিঠি লিখল। কারণ দিব্যেন্দু হঠাৎ হয়ত এসে হাজির হল, আর যেমন বেরসিক, তার নাম করে নমিতাকে উদ্ধার করা হয়েছে শুনে হয়ত হাটেই হাঁড়ি ভেঙ্গে দিল। অষ্টম পৃষ্ঠায় চিঠি শেষ করে মায়া অতিকষ্টে চিঠিখানা ভাঁজ করে খামবন্দী করে রাখল পরদিন সকালেই ডাকে দেবার জন্যে।

ছত্রিশ

দিব্যেন্দু উৎকণ্ঠার সঙ্গে মায়ার চিঠির অপেক্ষা করছিল। সে ধরে নিয়েছিল যে মুর্শিদাবাদে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে মায়া জানতে পারবে যে দিব্যেন্দুই নমিতার ছেড়ে যাওয়া স্বামী আর তাই নিয়ে একটা হুলস্থুল বেধে যাবে। শেষপর্যন্ত বিরূপবাবুর বিয়ে হবে কি না সে বিষয়েও তার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

মায়ার কাছ থেকে অত মোটা চিঠি পেয়ে দিব্যেন্দু ভেবেই নিল যে তার সমস্যা চরমে পৌঁছেছে। তাড়াতাড়ি খামখানা ছিঁড়ে সে চিঠি পড়তে শুরু করে দিল।—দুবার তিনবার চিঠিখানা

আগাগোড়া পড়ল। তবু যেন দিব্যেন্দু বিশ্বাস করতে পারল না মায়ার কথাগুলো। মায়া ঘুরিয়ে লেখেনি তো যে দিব্যেন্দুর কীর্তি সে জানতে পেরেছে, আর অপেক্ষা করছে তার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করবার ?

আর যদি তা না হয় ? যদি সত্যি হয় যে নমিতা এখনও পর্যন্ত তার স্বামীর পরিচয় কাউকে জানায় নি ? এমন কি তার অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও না ? তাহলে বুঝতে হবে নমিতার মনের জোরের কাছে দিব্যেন্দুর সব জোর হার মেনে গেছে। মানতে হবে যে মায়া তার সতিন একথা জানবার পরও মায়াকে কোন আঘাত না দিয়ে সে নিজেই সব আঘাত সহ্য করেছে।—এত কলঙ্ক, এত অপমান, সব সে মাথা পেতে নিয়েছে স্বামীর সম্মানের কোন হানি না করে।

দিব্যেন্দুর মাথার ভেতর সব যেন গুলিয়ে যেতে লাগল। নমিতার যে মূর্তি সে মনের মধ্যে এঁকেছিল তার সঙ্গে চিঠির নমিতার কোন মিল নেই। কয়েকদিন চেষ্টা করেও দিব্যেন্দু মনের ধাঁধার উত্তর বার করতে পারল না। বাধ্য হয়ে সে তাই রঞ্জিতের শরণাপন্ন হল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কী মনে হয় ?'

—'খাঁটি কথা বলব ?'—রঞ্জিত চেয়ারের ওপর পা গুটিয়ে গম্ভীর ভাবে তাকাল দিব্যেন্দুর দিকে।

—'বল।'

—'তাহলে শোন। রাম কেন সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন জান ? একটা মত হল—।' বলে রঞ্জিত শুরু করল। '—একদিন সীতাদেবী সখীপরিবৃতা হয়ে প্রসাধন করছিলেন। সেই সময় একজন সখী তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'অহো, মৈথিলি! আমাদের বহুদিনের বাসনা আপনার মুখ থেকে রাবণের প্রকৃত রূপবর্ণনা শুনব। আপনি কি কৃপা করে শোনাবেন ?' সীতা বললেন, 'কী করে শোনাব ? আমি তো কোনদিন রাবণের দিকে মুখ তুলে তাকাইনি।'

—'কোনদিন না?'

—'না।'

—'একবারও না?'

—'না।'

—'তাও কি সম্ভব? আপনি অতদিন লঙ্কাপুরীতে বাস করে এলেন, কোনও না কোনও সময়ে একবার অন্তত: দূর থেকে রাবণকে দেখেছেন। সেই রূপই বর্ণনা করুন।'

সীতা অনেকক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'লঙ্কাপুরীতে আমি রাবণকে দেখিনি, তবে রাবণ যখন আমায় হরণ করে সমুদ্রপার হচ্ছিল তার বিরাট ছায়া সমুদ্রের ওপর পড়েছিল, আমি মুখ নীচু করে কাঁদতে কাঁদতে সেই ছায়া দেখেছিলাম।'

সখীরা হর্ষধ্বনি করে বলে উঠলেন, 'সেই ছায়া কেমন তাই আমাদের বর্ণনা করে শোনান।' সকলে সীতাকে ঘিরে রাবণের রূপবর্ণনা শোনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে সীতার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সীতা কথা বললেন না। ময়ূরপুচ্ছ-অলংকৃত যে পাখা দিয়ে একজন সহচরী তাঁকে ব্যজন করছিলেন, সেই পাখাটি তিনি চেয়ে নিলেন। তার মধ্যিখানে যে গোলাকার স্থানটুকু ছিল তারই ওপর কজ্জলের কৃষ্ণ রেখা দিয়ে তিনি এক মূর্তি আঁকতে শুরু করলেন। অঙ্কন সবে শেষ হয়েছে এমন সময় শ্রীরামচন্দ্রের পদশব্দ শোনা গেল। সখীরা তো ত্রস্তা, ভীতা মরালের মত যে যেদিকে পারলেন পালিয়ে গেলেন। সীতা অনোন্যপায় হয়ে তাড়াতাড়ি পাখাখানা পালঙ্কের নীচে লুকিয়ে ফেললেন। অবিলম্বে শ্রীরামচন্দ্র এসে সেই পালঙ্কের ওপর বসলেন। কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতে শ্রীরামচন্দ্রের মনে হতে লাগল পালঙ্কের নীচে যেন আগুন জ্বলছে। কী উত্তাপ! কী অসহ্য এক অনুভূতি! পালঙ্ক দুলতে লাগল! এ কী হল? প্রলয় নয়, ভূমিকম্প নয়। স্নিগ্ধ মলয় গবাক্ষের ধারে গাছের পাতায় শিহরণ জাগাচ্ছে। তবে

পালঙ্ক এমন দুর্ব্যবহার করে কেন? সীতা কোন কৈফিয়ত দিতে না পেরে ঘর থেকে চলে যান। শ্রীরামচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে শেষকালে পালঙ্কের তলায় কুড়িয়ে পান রাবণের রূপাঙ্কিত পাখা। দেখে আবার পালঙ্কের তলায় রেখে দেন। সীতাকে কোন প্রশ্ন করেন না। —তার পরের ঘটনা সবাই জানে। এইবার ভেবে দেখ যে সীতাকে ত্যাগ করার সংকল্প শ্রীরামচন্দ্র কখন করেছিলেন। পালঙ্কের নীচে লুকোনো পাখার ওপর সীতার হাতে আঁকা রাবণের ছবি দেখে, না সীতার সম্বন্ধে কেউ সন্দেহের কারণ উল্লেখ করার পর, না দুর্মুখ অযোধ্যাবাসীদের কাছ থেকে অশুভ বার্তা নিয়ে আসবার পর? ভাল করে ভেবে দেখলে তুমি স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে পালঙ্কের তলা থেকে পাখা কুড়িয়ে পাবার পর যে সন্দেহের অঙ্কুরকে তিনি মনে স্থান দিলেন, সেই অঙ্কুরই বড় হয়ে বৃক্ষের আকার ধারণ করল। মানলাম, অঙ্কুর বড় হবার জন্যে জলহাওয়ার মত পারিপার্শ্বিক অনেক জিনিস সাহায্য করেছিল, কিন্তু প্রথম বীজ রোপণের জন্যে দায়ী—যাঁর ক্ষেত্র বা মন, অর্থাৎ স্বয়ং রামচন্দ্র। তুমি হাঁদা গঙ্গারাম নিজে যখন মনের মধ্যে সন্দেহের বীজ ছেড়ে একেবারে চারা পুঁতে বনমহোৎসবের মত একটা যজ্ঞি করেছ বলে মনে করলে, তখন কি খেয়াল হয়নি যে বাড়ির দেয়ালে বটবৃক্ষের মত সেই চারা শেষকালে তোমারই সর্বনাশ করবে?'

দিব্যেন্দু বললে, 'তোমারও নিজের মতের কোন স্থিরতা নেই। আজ বলছ এক রকম, কাল এক রকম।'

—'বলি, তুমি কি আমার মত নিয়ে নমিতাকে বিয়ে করেছিলে? তোমাকে আমি পই পই করে বলিনি যে নমিতাকে বিয়ে করতে যাওয়া তোমার একটা গোঁয়ারতমি? তার মধ্যে বিবেক, বুদ্ধি, ভালবাসা, কর্তব্য কিছুই ছিল না। এমন কি নমিতার

গান শুনে তুমি পাগল হয়ে গেলেও ঐ গান শোনাটাকেই তুমি ভালবাসতে, যে গান গাইত তাকে নয়। সুতরাং তুমি যে দুদিন যেতে না যেতে একটা ছুতো করে নমিতাকে চরম দুর্দশার মধ্যে ফেলে চলে আসবে, এবং তারপর যেন কিছুই হয়নি এই ভাব দেখিয়ে নতুন করে দাম্পত্যজীবন শুরু করবে, এ আর কেউ ভাবতে পারুক আর না পারুক আমার কাছে খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল।'

রঞ্জিতের কথায় তিতিবিরক্ত হয়ে দিব্যেন্দু বাড়ি ফিরে গেল।

পরদিন খুব সকালে উঠে দিব্যেন্দু সুটকেসে জামাকাপড় ভরছে দেখে মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছ?'

—'মুর্শিদাবাদে।'

—'বাঃ—চমৎকার! কাল বিয়ে হয়ে গেল, আর আজ বুঝি তোমার খেয়াল হল যে নেমন্তন্ন রাখা হয়নি!'

দিব্যেন্দু কোন কথা না বলে বাঁধাছাঁদা করতে লাগল। সুটকেস বন্ধ করার আগে তার দুটো জিনিস নেবার ছিল। আলমারির এক কোণে থাক দেওয়া জামাকাপড়ের তলা থেকে বার করল—একটা হাতকাটা ছিটের শার্ট, আর একটা খাপি মিলের ধুতি।

মুর্শিদাবাদ পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। ট্রেন থেকে ছিটের শার্ট আর মিলের ধুতি পরে নেমে, দিব্যেন্দু স্টেশন থেকে একটা সাইকেল-রিকশা ধরল।

আগের দিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে সে যখন মুর্শিদাবাদ আসার সংকল্প করেছিল তারপর ঘড়ির কাঁটা অনেকবার ঘুরে গেছে। কিন্তু দিব্যেন্দু এখনও ঠিক জানে না সে কেন মুর্শিদাবাদে এল। আর কয়েক মিনিট পরেই তাকে এ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

তাকে দাঁড়াতে হবে মায়ার সামনে যাকে সে ঠকিয়ে বিয়ে করেছে—তাকে সম্মুখীন হতে হবে নমিতার, যাকে সে একদিন সসম্মানে বরণ করে এনে পরদিন অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাকে অপরাধ স্বীকার করতে হবে বিরূপের কাছে, যাকে সে অকারণ কলঙ্কের কালি মাখিয়ে শ্রীহীন করবার চেষ্টা করেছে। দিব্যেন্দু কী বলবে তাদের? কী কৈফিয়ত দেবে তার একাধিক অপকর্মের ?

ভাবতে ভাবতে দিব্যেন্দুর দুর্বল মনে হতে লাগল নিজেকে। আর সে ভাববে না। আত্মসমর্পণ করবে। মাথা পেতে নেবে সব শাস্তি।

এমন সময় তার খেয়াল হল সাইকেল-রিকশা দাঁড়িয়ে পড়েছে। সামনে একটা বিয়ে বাড়ির নহবতখানা। রিকশাওয়ালা উলটো চেন ঘোরাতে ঘোরাতে বলছে এই বাড়িতেই নাকি উকিলবাবুর খোঁড়া মেয়েটির বিয়ে হয়েছে।

দিব্যেন্দু নেমে পড়ল। এটাই বিরূপবাবুর বাড়ি তা যাচিয়ে নিয়ে ভেতরে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

কাল বিয়ে হয়ে গেছে। একটু পরেই বর-কনে আসবে। বিভূতি গেছে তাদের আনতে। মেয়েরা বধূবরণের আয়োজনে ব্যস্ত।

এর মাঝখানে দিব্যেন্দু গিয়ে পৌছতে অন্দরমহলে সাড়া পড়ে গেল। দিব্যেন্দুর আগেই দেখা হল মায়ার সঙ্গে। মায়া তার বেশ দেখে চমকে উঠল। বললে, 'বিয়ে বাড়িতে বরের চাকরের মত সেজে এসেছ কেন? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

দিব্যেন্দু বলল, 'তোমায় তো বলেছিলুম জীবনে প্রথম অভিনয় করেছিলুম এই বেশ পরে। আজ আবার অভিনয় করতে এলুম নাটকের অন্য অঙ্কে।'

মায়ার তখন হেঁয়ালী নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না। বললে, 'ওসব ন্যাকামি রাখ। যাও তাড়াতাড়ি চান করে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এস। এখুনি বর-বউ আসবে।'

দিব্যেন্দু এসেছে শুনে হেমাঙ্গিনী সঙ্গে সঙ্গে চাকরবাকরদের হুকুম দিয়ে দিলেন জামাইবাবুর জিনিসপত্রগুলো ঘরে তুলে, জামাইবাবুর জন্যে স্নানের জল, সাবান, তোয়ালে সব ঠিক করে রাখতে। তারপর বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াতে দিব্যেন্দু প্রণাম করবার জন্যে এগিয়ে গেল। হেমাঙ্গিনী আশীর্বাদ করে বললেন, 'তোমার আশায় আশায় কদিনই বসেছিলুম। খালি মনে হত, ঐ বুঝি দিব্যেন্দু এল। যাক, তুমি যে শেষপর্যন্ত এসেছ এতেই আমার আনন্দ। একটু জিরিয়ে নাও—সারাদিন ট্রেনের ধকল তো কম যায় নি।' তারপর মায়াকে বললেন, 'দিব্যেন্দুকে বরঞ্চ ছাতের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা। নীচে বেচারীর কষ্ট হবে। একে পাখা নেই, তার ওপর কাজকর্মের ভিড়।'

মার কথা মত মায়া দিব্যেন্দুকে ছাদে নিয়ে গিয়ে দেখল ঘর বন্ধ। মায়া জোরে জোরে দুবার দরজাধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে বলল—'ঘরে কে রে? শিগগির দরজা খোল্।'

কেউ দরজা খুলল না দেখে মায়া ছাদের দিকের জানলার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল ঘরের এক কোণে কে একজন লুকোবার চেষ্টা করছে। চিনতে পেরে মায়া ধমক দিয়ে বললে, 'এই নমি, কী হচ্ছে? দরজা খোল্ শিগগির। একটা নতুন জিনিস দেখাব।'

নমিতা কোন কথা না বলে এমন জায়গায় লুকিয়ে পড়ল যে জানলা দিয়ে তাকে দেখা না যায়। নমিতার ছেলেমানুষিতে

বিরক্ত হয়ে মায়া ঘুরে এসে আবার দরজা ধাক্কা দিতে লাগল। তারপর খানিকক্ষণ জোরে জোরে ধাক্কা দেবার ফলে দরজার ছিটকিনিটা আপনা হতেই খুলে গেল।

মায়া ঘরের ভেতর ঢুকে দেখল নমিতা দেয়ালের কোণে মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মায়া তার হাত ধরে টানতে টানতে বলল, 'এদিকে ফের্‌না। কী ন্যাকামি করছিস? ঘরে কে এসেছে, ছাখ্‌।' বলে মায়া নমিতার কানে কানে কী বলল।

দিব্যেন্দু ঘরের চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়েছিল। চুপ করে থাকতে না পেরে বললে, 'তোমার জন্মেই আমি এলাম, আর তুমি যদি আমার দিকে ফিরেও না চাও, বল আমি সন্ধ্যের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।'

মায়া সায় দিয়ে বলল, 'সত্যিই তো! পাছে তোকে আবার কোন বিপদে পড়তে হয়, তাই তো আমি জোর করে ওকে আনালুম। আর তুই এমন ভাব দেখাচ্ছিস যেন ও তোর ভাসুর।'

দিব্যেন্দু হেসে বললে, 'নমিতা হয়ত আমায় চিনতে পারেনি। হয়ত ও বুঝতে পারেনি যে আমি দিব্যেন্দু চৌধুরী—যাকে সে স্বামী বলে সকলকার কাছে পরিচয় দিয়েছে।'

—'তোমার যেমন বুদ্ধি! বুঝতে পেরেছে বলেই তো ওর এত লজ্জা।'

—'এখন লজ্জা করলে তো চলবে না। নমিতা যখন আমায় স্বামী বলে স্বীকার করেছে, তখন আমিও ওর স্বামী সাজতে বাধ্য। সুতরাং হয় ও আমাকে স্বামী বলে মেনে নিক, নয়ত সকলকে ডেকে বলুক ইনি আমার স্বামী নন, ইনি একজন ভণ্ড, স্বামী সেজে আমার সর্বনাশ করতে এসেছেন।'

দিব্যেন্দুর রসিকতায় মায়া রেগে গেল। বললে, 'কী যা-তা বলছ। ও যাও বা তোমার সঙ্গে কথা বলত, এ রকম অসভ্য ইয়ারকি করলে ও জন্মেও তোমার সঙ্গে কথা বলবে না।'

—'বেশ। তাহলে আমি এখনই কলকাতায় ফিরে চললুম।'

এবার নমিতা মুখ ফেরাল। এতদিন পরে দিব্যেন্দুর কণ্ঠস্বর শুনে তার মনের মরচে পড়া তন্ত্রীগুলো থেকে খনখনে আওয়াজ ছাড়া আর কোন সুর বেরল না। বরঞ্চ ভয় হল যে কোন তন্ত্রী যে কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে। কিন্তু দিব্যেন্দুর দিকে চাইতেই নমিতার মনে পড়ে গেল, এই বেশে দিব্যেন্দু শেষবারের মত বিষ্ণুপুর ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। হঠাৎ নমিতার কী হল, মাথার ঘোমটাটা সামলে দিব্যেন্দুকে ঢিপ করে একটা পেন্নাম করে এল।

মায়া বলে উঠল—'দেখ, দেখ! তুই কি সত্যিই পাগল হয়ে গেলি? শুধু শুধু ওর পায়ের ধুলো নিতে গেলি কেন?'

দিব্যেন্দু বললে—'তার মানে নমিতা বুঝিয়ে দিল যে সে সত্যিই আমায় স্বামী বলে মেনে নিয়েছে।'

মায়া দিব্যেন্দুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'কী তোমার কথা বলার ছিরি!'

দিব্যেন্দু মায়ার কথায় কান দিল না। বললে, 'নমিতা যখন আমায় স্বামী বলে স্বীকার করল, আমিও তখন স্বীকার করছি যে নমিতা আমার স্ত্রী।' বলে এগিয়ে গিয়ে সে দুটো হাত নমিতার কাঁধে রাখল।

এতক্ষণে মায়ার হুঁশ হল। নিমেষে তার মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। দিব্যেন্দুকে বলল, 'মানে? এতদিন যে স্বামীর পরিচয় নমিতা লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল, তুমি কি সত্যিই সেই স্বামী?'

দিব্যেন্দু চুপ করে রইল।

মায়া গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'নমিতাকে লুকিয়ে বিয়ে করে, তুমি আবার আমাকে বিয়ে করেছ? তুমি এত নীচ? তুমি এত জঘন্য?—তুমি—তুমি—ছোটলোকের অধম—তুমি পশু—তুমি শয়তান—তুমি জোচ্চোর—।' বলে মায়া পাগলের মত ক্ষেপে

উঠল। হাতের কাছে যা পেল তাই ছুঁড়তে লাগল দিব্যেন্দুকে লক্ষ্য করে।—ঘড়ি, আয়না, বালিশ, ছবি, চিরুণী, গেলাস, ফুলদানি। ঝনঝন করে কোনটা ভেঙ্গে পড়ল, কোনটা ভাঙ্গল জানলার কাঁচ।

বাড়িশুদ্ধ লোক আচমকা কাঁচভাঙ্গা আর জিনিস ছোঁড়ার আওয়াজে রীতিমত ভয় পেয়ে একতলা থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে গেলেন—'কী হয়েছে? ওপরে এত আওয়াজ কিসের?'

মায়া হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে হঠাৎ ছুটে গিয়ে নমিতার গলা জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'তুই একবার যদি আমায় জানাতিস!—কেন তুই এমন করলি?'

হেমাঙ্গিনী পড়ি কি মরি করে সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ওপরে উঠলেন। ঘরে ঢুকে থ হয়ে গেলেন। মায়া নমিতাকে জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে—আর দিব্যেন্দু অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে—তার একটা হাত কেটে রক্ত পড়ছে। এক মুহূর্তে হেমাঙ্গিনীর কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। আর সকলকে নীচে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি এক হাতে মায়া, আর এক হাতে নমিতাকে জড়িয়ে খাটের ওপর বসলেন। দুজনের গাল ধরে আদর করে বললেন, 'তোদের এমন ভাব ছিল যে একদিন না দেখা হলে তোরা কেঁদেকেটে অনর্থ করতিস। মায়া তো বলেই দিয়েছিল যে নমিতার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলে সে আর বাঁচবে না।' বলে মায়ার দিকে ফিরে বললেন, 'তুই সে কথা ভুলে গেলেও, ভবি ভোলেন নি রে!'

এমন সময় বাড়ি কাঁপিয়ে মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়ে উঠল। নহবতখানায় শানাই সিন্দুরার সুর ধরল। সুনীলা খবর দিয়ে গেল 'বর-বউ এসেছে।' হেমাঙ্গিনী চোখ মুছে বললেন, 'নিজের মেয়ে পর হয়ে গেছে, এবার পরের মেয়েকে ঘরে তুলে আনতে যাই।' বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

বিরূপ গাড়ি থেকে নেমে যেই শুনল দিব্যেন্দু এসেছে, অমনি গাঁটছড়া ফেলে, দৌড়ে, সিঁড়ির ধাপ টপকাতে টপকাতে একেবারে ছাদের ঘরে গিয়ে হাজির হল। দিব্যেন্দুর দিকে চোখ পড়তে একগাল হেসে বলল, 'এতদিনে রাগ পড়ল?' দিব্যেন্দু লজ্জিত হয়ে বিরূপকে প্রণাম করে বলল, 'আমায় ক্ষমা করুন।'

বলাবাহুল্য, দিব্যেন্দুর কাহিনী সহরময় ছড়িয়ে পড়ল, এবং যাঁরা ভবিতব্যে বিশ্বাস রাখেন তাঁরা বললেন এ সমস্ত বিধাতারই কারসাজি—দুই বন্ধুকে সতিন সাজিয়ে দুষ্টুমির খেলা খেললেন খানিকটা!

যাই হোক, স্থির হল আপাততঃ মায়াকে নিয়ে দিব্যেন্দু ফিরে যাবে এবং পরিতোষবাবুর মত না পাওয়া পর্যন্ত নমিতা হেমাঙ্গিনীর কাছে থাকবে।

দিব্যেন্দু দেরি করল না। ফুলশয্যার পরদিনই মায়াকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

মায়া আপত্তি করেছিল দিব্যেন্দুর সঙ্গে যেতে। হেমাঙ্গিনী জোর করে পাঠালেন। বললেন এখন দিব্যেন্দুর কাছে কাছে থাকা তার দরকার, কারণ দিব্যেন্দুর বাবা সব শুনে কী করে বসেন কিছু বলা যায় না। হেমাঙ্গিনী মায়াকে গোপনে আরও অনেক উপদেশ দিলেন এবং বিশেষ করে বললেন সে যেন এ নিয়ে দিব্যেন্দুকে উত্ত্যক্ত না করে।

মার উপদেশ পুরোপুরি পালন করা কিন্তু মায়ার পক্ষে সম্ভব হল না। ফাঁকা ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় দিব্যেন্দুকে একলা পেয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে এই কদিনের জমান রাগ উগরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। মুর্শিদাবাদে ঝগড়া হবার পর দিব্যেন্দুর সঙ্গে আর তার নিভৃতে বাক্যালাপ হয়নি। তার মনের মধ্যে যে ঝড় বইছিল কাউকে সে তা জানতে দেয়নি। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে

সে দেখিয়ে এসেছে যে নমিতাকে সে হাসিমুখে সতিন বলে মেনে নিয়েছে। সে কি পাগল যে অমন অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধুকে হিংসে করবে ?—হলই বা সে সতিন ?

কিন্তু এখন আর তার চক্ষুলজ্জা নেই। দিব্যেন্দুর দিকে না চেয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, 'মা কলকাতায় ফিরে গেলে আমায় মার কাছে পাঠিয়ে দিও।'

দিব্যেন্দু ভালমানুষ সেজে বলল, 'আমার আর কিছু বলবার মুখ নেই। তোমরা সবাই যা ব্যবস্থা করবে তাই হবে।'

মায়া জ্বলে উঠল। স্বামীর সব অপরাধ সে মার্জনা করতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু ভণ্ডামি নয়। বেগতিক দেখে নমিতাকে গ্রহণ করা না করার দায়িত্ব এখন মায়ার ওপরই চাপাতে চান নাকি তিনি ? মায়া ঘাড় বেঁকিয়ে বলে উঠল—'তুমি কি আমাকে নমিতার মত নির্লজ্জ, গোবেচারা মেয়ে পেয়েছে যে মনে করছ এর পরেও তোমার পায়ের তলায় বসে চুল দিয়ে তোমার পা মুছিয়ে দেব ? ওসব বুজরুকি আমি ঢের দেখেছি। কলকাতার বাড়িতে নমিতাকে নিয়ে আসার কথা ভেবে থাক তো ভুলে যাও। তাকে স্ত্রী বলে যখন স্বীকার করেছ তার জন্যে একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দিতে চাও, দিও। তাবলে এক বাড়িতে তাকে আর আমাকে সাজিয়ে তুমি চিঁড়িয়াখানা খুলবে আর লোকে দেখে টিপপুনি কেটে চলে যাবে, সে অপমান আমি সহ্য করতে পারব না। তার আগে আমি গলায় দড়ি দেব, আর সেই সঙ্গে তোমাকেও ফাঁসিকাঠে ঝোলাব—এ তুমি জেনে রেখ।'

মায়ার কথা শুনে দিব্যেন্দু ঘাবড়ে গেল। সে বুঝতে পারল না তার কী করা উঠিত। তার অপরাধ খণ্ডাতে গেলে তাকে কি এবার মায়ার ওপরই অবিচার করতে হবে ? কিন্তু নমিতার মনে মিথ্যে আশার সৃষ্টি করে সে যদি দ্বিতীয়বার নমিতাকে ঠকায় তাহলে যে শয়তানও তাকে ক্ষমা করবে না !

মায়াকেও দোষ দেওয়া যায় না। সে তার প্রাপ্য বুঝে নিতে চায়। দিব্যেন্দু প্রায়শ্চিত্ত করবে বলে তার দাবি সে ছেড়ে দেবে না। নমিতা সুখী হবে কি হবে না এ মাথাব্যথা তার নয়। সে নমিতাকে ভালবাসবে যতক্ষণ নমিতা তার বন্ধু। যদি শত্রু হয়ে নমিতা তার মাথার ওপর খড়্গধারণ করে মায়া তাকে ক্ষমা করবে না।

সাঁইত্রিশ

কলকাতায় পৌঁছে মায়া সব কথা জানাল শ্বাশুড়িকে। তিনি স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। দুদিন পরে মায়াকে ডেকে বললেন তার ওপরই ভার পড়েছে নমিতার ব্যবস্থা করবার। শুনে মায়া যেন বদলে গেল। বললে, তাহলে বধূবরণ করে নমিতাকে ঘরে আনতে হবে, আর সে এ বাড়িতে থাকবে পাটরাণীর মত, চাকরাণীর মত নয়। দিব্যেন্দুর মা শুনে ক্ষীণ হাসি হাসলেন। আশীর্বাদ করলেন মায়াকে।

কয়েকদিন পরে মুর্শিদাবাদ থেকে চিঠি এল। হেমাঙ্গিনী ফিরে আসছেন সকলকে নিয়ে।

ট্রেন আসার অনেক আগেই দিব্যেন্দু স্টেশনে গিয়ে হাজির হয়েছিল। ট্রেন আসতে ভিড়ের ভেতর খুঁজতে খুঁজতে একেবারে পেছনের দিকের একটা কামরায় সকলের দেখা পেল। তখনও সব মালপত্র নামান হয়নি।

নমিতাকে দেখতে না পেয়ে দিব্যেন্দু এদিক ওদিক তাকাতে হেমাঙ্গিনী বললেন, 'নমিতা আসেনি।'

দিব্যেন্দু আশ্বস্ত হল। বললে, 'হ্যাঁ—এখন বিরুদার কাছে কিছুদিন থাকুক—তারপর ধীরে সুস্থে—।'

হেমাঙ্গিনী বাধা দিয়ে বললেন, 'তাহলেও তো কথা ছিল। কিন্তু মুর্শিদাবাদেও সে নেই। হঠাৎ মায়ার চিঠি পেয়ে কাউকে কিছু না বলে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।'

দিব্যেন্দুর চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল।

হেমাঙ্গিনী বললেন, 'তবে, নমিতা বিরুকে নাকি একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে।—তাতে লিখেছে তার খোঁজখবর যেন কেউ না করে।'

—'তা কি হয় ?' দিব্যেন্দু কর্তব্যপরায়ণের মত প্রশ্ন করল।

—'কি জানি বাবা। বিরু হয়ত জানে সব কথা। ভাঙ্গল না। শুধু বারণ করে দিল এ নিয়ে হাঙ্গামা করতে।'

দিব্যেন্দু হতবুদ্ধি হয়ে বাড়ি ফিরল। মায়ার ওপরও বিরক্ত হল খানিকটা। নিশ্চয় মায়া এমন কিছু লিখেছে যাতে নমিতা বুঝতে পেরেছে যে স্বামী তাকে গ্রহণ করলেও স্বামীর সংসারে সে কোনদিন ঠাঁই পাবে না। মায়ার সঙ্গে দেখা হতেই দিব্যেন্দু তাই জিজ্ঞেস করে বসল, 'নমিতাকে কী লিখেছিলে ?'

—'কেন ?'

—'তোমার চিঠি পেয়ে সে একা একা কোথায় চলে গেছে—আর তোমার ছোটদাকে নাকি চিঠি লিখে অনুরোধ জানিয়ে গেছে আমরা যেন তার খোঁজ না করি।'

মায়া কোন কথা বলল না। তার দুচোখ জলে ভরে উঠতে লাগল। নমিতাকে সে চিঠি লিখেছিল ঠিকই, তবে তাতে সে আমন্ত্রণ

জানিয়েছিল তার আর শ্বশুরশ্বাশুড়ির পক্ষ থেকে—নমিতা যেন স্বামীর সংসার আলো করার অধিকারে কলকাতায় ফিরে আসে।

মায়া আড়ালে চলে গেল। কাকে সে বোঝাবে যে নমিতার জন্যে আবার তার নতুন করে মন কেমন করছে—চোখ বুজে বলতে ইচ্ছে করছে, হে ঈশ্বর! আমাদের দুজনের বন্ধুত্ব চিরদিন যেন অটুট থাকে!

একই সময়ে ট্রেনের জানলার ধারে বসে নমিতা গালে হাত দিয়ে ভাবছিল। ট্রেনের দোলানিতে তার স্মৃতির ঝাঁপি দুলে দুলে উঠছিল।—তার মধ্যে হাজার টুকিটাকি সম্পদ, যা রেখেও লাভ নেই, ফেলে দেবারও উপায় নেই।

বিরুদাকে যে চিঠিখানা সে লিখে রেখে এল সেটা যেন বারে বারে উড়ে আসতে লাগল তার চোখের সামনে। প্রত্যেকটি অক্ষর গেঁথে আছে তার মনে। কোনদিন সে ভুলবে না নিজের চিঠি, শেষ দানপত্র। বেশী কথা সে লেখেনি। লিখেছে যে মেয়েদের বিয়ে একবারই হয়, হয়ত সেই জন্যে দিব্যেন্দুর সঙ্গে লোকদেখান বিয়ে তার সইল না। তাই সে যাচ্ছে বরোদায় ললিতবাবুর গুরুর কাছে তার প্রথম স্বামীর সন্ধানে—যদি তাঁর সেবা করে বাকী জীবনটা তার শান্তিতে কাটে। বিরুদাকে অনুরোধ, যেন তিনি কাউকে না জানান নমিতা কোথায় গেল—কেউ যেন তার খোঁজ না করে কোনদিন—তাকে সোনার খাঁচায় আর যেন বন্দী করার চেষ্টা না করা হয়। বিরুদা যেন ভুলে যান নমিতাকে, মার্জনা করেন তার সকল অপরাধ, অকর্মণ্যতা।